প্রসঙ্গ ত্রিপুরা

সম্পাদনা

নিলিপ পোদ্দার

পৌণমী প্রকাশন

আগরতলা, ত্রিপুরা

PROSANGA TRIPURA

a collection of essays

স্মৃতি পোদ্দার কতৃক ৬০, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ১২ অক্টোবর, ১৯৯৬ ইং ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১জুলাই, ১৯৯৭ ইং। প্রেস শপি কলকাতা ... কে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ঃ নিলিপ পোদ্দার ও প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ সানগ্রাফিকস, আগরতলা, ত্রিপুরা।

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'প্রসঙ্গ ত্রিপুরা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে প্রথম প্রকাশের ছ'মাসের মধ্যেই। রাজ্য এবং বর্হিরাজ্যের পাঠকমহলে বইটির এই সমাদরে আমরা অভিভূত এবং উৎসাহিত। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময আমরা আরো একটি নিবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করেছি। শ্রী কৃষ্ণপদ দত্তর 'আবৃত ইতিহাস ঃ ইংরেজ পর্ব' নামের নিবন্ধটি বন্ধুবর স্বপন সেনগুপ্তর সৌজন্যে আমরা অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছি। এই নিবন্ধটি সংকলিত হওয়ায় বইটি পূর্ণাঙ্গতার দিকে আরো একটু অগ্রসর হল এবং ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি অনালোচিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব হল।

প্রথম সংস্করণের মত দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠকমহল সমাদরে গ্রহণ করে ত্রিপুরা সম্বন্ধীয় নিবন্ধমূলক গ্রন্থপ্রকাশে আমাদের উৎসাহিত করবেন এই আশা রাখি।

—সম্পাদক

প্রথম সংস্করনের ভূমিকা

ত্রিপুরাকে 'পাণ্ডব-বর্জিত' এলাকা হিসেবে অভিহিত করে এর দুর্গমতা এবং অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতাকে যেমন প্রকট করা হয়েছে, তেমনি আর্য সভ্যতা থেকে এ অঞ্চল যে বিযুক্ত তাকেও ইঙ্গিতময় করা হয়েছে। পঞ্চদশ বা যোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবহিত না হলেও এর পরবর্তী সময় থেকে আর্যাবর্ত্তের সংস্কৃতির সঙ্গে এ যে সম্পর্কচ্ছিন্ন ছিল না তা আমরা জানতে পারি। আর্যাবর্ত্তের সংস্কৃতির ধার করা আলোয় এই পার্বত্য কন্যার মুখ কতটুকু উজ্জ্বল ছিল তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু এ রাজ্যের আদি-অধিবাসীদের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত ছিল বহুকালাবধি এ ইতিহাস আজ আর সংগুপ্ত নয়। এ রাজ্যের আদি অধিবাসীদের সংস্কৃতিকে পরবর্তী সময়ে তাদের জুম-নির্ভব জীবন চর্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জুম-সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। জুম সংস্কৃতির একটি নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে যা আর্যাবর্ত্তের লালিত সংস্কৃতি থেকে অনেক ভিন্ন।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে বহু লালিত আর্যাবর্ত্তের সংস্কৃতি — যা পরবর্তী সময়ে রাজদরবারে লালিত-পালিত হয়ে দরবারী সংস্কৃতি হিসেবে খ্যাত হয়েছে। অনেক পরে, সম্ভবত চল্লিশের দশক থেকে জুম সংস্কৃতিকে পাদপীঠেব আলোয আনার প্রয়াস লক্ষিত হয এবং পরবর্তী সময়ে এই দুই সংস্কৃতির মিশ্রণের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত এবং বলা বাহুল্য অসমাপ্ত।

দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এ রাজ্যের জীবনচর্যায় যেমন, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটি নবতর বাঁক পরিলক্ষিত হয়। এখানকার দরবারী সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্য ছিল, ছিল জুম সংস্কৃতির প্রবাহ, এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত জনসাধারণের নিজস্ব কিছু আঞ্চলিকতা বিশিষ্ট সংস্কৃতিও। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলা যায় সংস্কৃতির এই ত্রিধারা এখন পাশাপাশি প্রবাহিত।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থে ত্রিপুরার এই বিশিষ্টতর সংস্কৃতির কিছু রূপরেখা আমরা অঙ্কনের চেষ্টা করেছি। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে ও অকপটে একথা স্বীকার করতে চাই যে আমাদের এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। ত্রিপুরাব সংস্কৃতির, তার সাহিত্য-শিল্পকলাব সকল

ধারার প্রতি আমরা সমান নজর দিতে পারিনি, অথবা সমানভাবে উপস্থাপিত করতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব কিছু অসুবিধেও ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে (যে বিষয়গুলো অনালোচিত) সম্যক অবহিত লেখকের অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছি। বৃহৎ কলেবর পুঁস্তকের বাজারজাত করার বিড়ম্বনার কথাও আমাদের ভাবতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়েছি যাতে ত্রিপুরার প্রবহমান সংস্কৃতির অতীত-বর্তমান বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা অকাতরে পেয়েছি বলেই আমাদের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই সুযোগে আমরা এই গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে দুজনের প্রয়াণ আমাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অন্তর্গত। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ আমাদের ইতিহাসে খ্যাত ব্যক্তি পুরুষ। ত্রিপুরার প্রাচীন ভৌগোলিক রূপ সম্বন্ধে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ত্রিপুরার আদিবাসী লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে মহেন্দ্র দেববর্মার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কারো নাম আমাদের জানা নেই। আর রাজআমলের চিত্রকলা বিষয়ে সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণের লেখাই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য লেখকদের রচনাগুলো তাদের অধীত বিষয় ও বহুচর্চিত। এ বিষয়ে তারা বহুবার অনেকস্থানে লেখালেখি করেছেন। আমবা শুধু তাদের বিশিষ্ট লেখাগুলো যা আমাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাই গ্রহণ করেছি।

এ গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে অনেকেই সাহায্য করেছেন, যাদেব সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হতো। বন্ধুবর দিলীপ দাস, রাতুল দেববর্মণ, জ্ঞান বিচিত্রা প্রেসের কর্ণধার দেবানন্দ দাম ও তার সহকারীদের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে একটা কথা বলবো এই গ্রন্থ যদি কারো বিশেষ কোন কাজে সাহায্য করে তবেই আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হবে বলে মনে করি।

— নিলিপ পোদ্দার

জেলা ত্রিপুরা

কৈলাশ চন্দ্র সিংহ

জেলা ত্রিপুরার সৃষ্টিকাল হইতে ইহার পরিমাণ ও সীমা অবিশ্রান্ত পরিবর্তন হইতেছে। বিধাতা যেরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমাদের বিধাতৃ-পুরুষ ইংরেজ কর্তৃপক্ষও এ বিষয় লইয়া তদ্রূপ অবিশ্রান্ত ক্রীড়া করিতেছেন।

অধুনা ত্রিপুরা জেলা ২৩ ০´ এবং ২৪ ১৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৩৬´ এবং ৯১ ৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২৪৯১ বর্গমাইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ১৭৮২৯২৫ নির্ণীত হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরা (পার্বত্য) রাজ্য। উত্তরে জেলা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ। পশ্চিমে মেঘনাদ নদ এই জেলাকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দক্ষিণে নওয়াখালি জেলা। কিন্তু নওয়াখালিকে ত্রিপুরা জেলার একাংশ মনে করিলে এই জেলার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং এই জন্য কবি চূড়ামণি কালিদাস ত্রিপুরাকে "তালীবনশ্যামমুপ কণ্ঠং মহো দধেঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাল, খেজুর, নারিকেল, গুবাক জাতীয় পাদপ শ্রেণী অদ্যাপি সেই প্রাচীন কবির বর্ণনা সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

জেলা ত্রিপুরা একটি সমতল ক্ষেত্র। ত্রিপুরা পর্ব্বতের পাদমূল হইতে মৃত্তিকা ক্রমে পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। একমাত্র লালময়ী, ময়নামতী ব্যতীত ইহাতে কোন পর্ব্বত বা উচ্চভূমি নাই। জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে পর্ব্বতের প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত উচ্চভূমি এবং পশ্চিমে মেঘনাদ নদের স্রোত প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা গঠিত নবীন "চর" সকল, নবাগত ব্যক্তিদিগের নয়নে দুইটি প্রাকৃত দৃশ্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকের ভূমি, নিম্ন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরা জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধহয় এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। নদী স্রোতে প্রবাহিত কর্দমরাশি দ্বারা সেই হ্রদ ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্টি করিয়াছে। বিলের কান্দীগুলিতে মনুষ্যের বাস হইয়াছে। বর্ষার জল প্লাবনে যখন সরাইল নূরনগর প্রভৃতি পরগণা ভাসিয়া যায়, তৎকালে গ্রামগুলিকে তরুরাজি শোভিত এক একটি দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। বর্ষার সময় সরাইল ও নূরনগর পরগণার অধিকাংশ ভূমি জলে নিমজ্জিত থাকে। ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া মেঘনাদ নদ প্রবাহিত হইতেছে। ইহার একটি প্রধান শাখা তিতাস নামে পরিচিত। তিতাস নদী গোয়ালনগরের নিকট মেঘনাদ হইতে বহির্গত হইয়া সরাইল পরগণা প্রদক্ষিণ করতঃ লালপুরের নিকট মেঘনাদে পতিত হইতেছে। ত্রিপুরার পর্ব্বত জাত হাওড়া, লৌহয় প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী

তিতাসকে করদান করিতেছে। তিতাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯২ মাইল হইবে। ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত গোমতী, ডাকাতীয়া প্রভৃতি নদীগুলি মেঘনাদে পতিত হইতেছে। এই সকল নদ-নদীর মধ্যে ডাকাতীয়ার দৈর্ঘ্য সর্ব্বাধিক, তাহা ১৫০ মাইলের ন্যূন হইবে না। এই নদী সুয়াগাজির নিকট ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের নিকট মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে লালময়ী-ময়নামতী পর্ব্বত অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল। ইহার পরিধি ২১ মাইল। এই পর্ব্বত সমতল ক্ষেত্র হইতে গড়ে ৪০ ফিট উচ্চ। কিন্তু ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ হইবে। অধুনা এই পর্ব্বতটি জঙ্গলাবৃত, কিন্তু প্রাচীনকালে এই পর্ব্বতে মনুষ্যের বাস ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "কালীর বাজার রাস্তা" প্রস্তুতকালে পর্ব্বত শিখরে একটি সুন্দর দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই দুর্গের পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর দেবমূর্ত্তি সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে রণবঙ্কমল্লের তাম্র শাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাহাও এই পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ-মেজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব তৎকালে সেই তাম্র-শাসন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন।

এই পর্ব্বতটি ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার স্বাধীন রাজ্যের একাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন কোন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ লিখিয়াছেন (Sutherland's "Tipperah")। অল্পকাল হইল গভর্ণমেন্টের সহিত এই পর্ব্বত লইয়া মহারাজের একটি বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে গভর্ণমেন্ট ২১০০ হাজার টাকা সেলামী গ্রহণে লালময়ী পর্ব্বতটি লাখেরাজস্বরূপ মহারাজকে দান করেন কিন্তু ময়নামতী শৃঙ্গটি ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাহার পত্নীর নাম ময়নামতী এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল, তদনুসারে এই পর্ব্বত লালময়ী ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং আধুনিক ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন লক্ষণাবতীর (গৌড়ের) বিদ্রোহী 'মালীক' (গভর্ণর) সুলতান মগিসুদ্দিন তুগ্রল সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজপাট সুবর্ণগ্রামে স্থাপিত হওয়ার পর তাহারা ত্রিপুরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের বিবেচনায় সুলতান মগিসুদ্দিন তুগ্রল সর্ব্বপ্রথম (১৩৪৭ খৃঃ) ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। সে সময় হইতে সমতলক্ষেত্র মুসলমান রাজ্যভুক্ত হওয়ার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পাঠানগণ ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র অধিকারের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ লক্ষ্মণ সেনের ন্যায় কাপুরুষোচিত ব্যবহার করেন নাই। তাহারা যে কেবল হৃত অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন এমত নহে, সুযোগমত তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করতঃ পাঠানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

রাজা তুডরমল্লের কৃত ওয়াশীল তুমরজমায় সীমান্তস্থিত যে সমস্ত মহালের তালিকা প্রদত্ত

হইয়াছে সম্রাট আকবর তাহার করগ্রাহী ছিলেন না। কিন্তু বিখ্যাত পাঠান সম্রাট শেরশাহ যে এই সকল স্থান কিছুকালের জন্য করতলস্থ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কারণ সীমান্তস্থিত মহালসমূহের জন্য তুডরমল্ল শেরশাহের ওয়াশীল তুমরজমায় নকলনবিস মাত্র। মুসলমানগণ তিনদিক হইতে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। এ জন্যই ওয়াশীল তুমরজমায় সরকার সুবর্ণ-গ্রাম, সরকার শিলহট্ট (শ্রীহট্ট) ও সরকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত মহালসমূহের তালিকার মধ্যে ত্রিপুরার কোন কোন অংশ সংযোজিত দৃষ্ট হইতেছে।

এই সকল মহালের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল। অবশিষ্টগুলি সামন্ত নরপতি ও জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। জমিদারগণ নিয়মিতরূপে ত্রিপুরাপতিকে করদান করিতেন এবং সামন্ত নরপতিগণ ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। বলদাখালের অধিপতি ঈশা খাঁ কিয়ৎপরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। তুডরমল্ল যৎকালে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তৎকালে আবুল ফজল ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারী রলফ ফিছের বর্ণনা দ্বারা আবুল ফজলের লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এই সময় ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। যে সকল পরগণা সামন্ত নরপতি কিংবা জমিদারগণের অধিকারে ছিল, তাহা চিরকালের তরে ত্রিপুরেশ্বরদিগের করচ্যুত হইল। যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল, তাহা মোগলগণ অধিকার করিয়া লইলেন। সেই অংশ 'সরকার উদয়পুর' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সরকার ৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। নূরনগর, মেহেরকুল ব্যতীত অন্য দুইটি পরগণার নাম আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তৎকালে এই সরকারের রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা অবধারিত হয়।

ধরচৌধুরী বংশের বংশাবলীর মতে ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মতান্তরে ১০২৩ কিংবা ১০৩০ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই সময় সরাইল পরগণাটি মহারাজের হস্তচ্যুত হয়। সরাইলের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এবং লৌহগড়ের উত্তর দিকস্থ ভূভাগ মোগলাধিকারের পূর্ব্বে হিউং বিউং ও কৈলার গড় নামক তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার উদয়পুরের প্রথম শাসনকর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ সেই তিন ভাগ একত্র করিয়া স্বীয় নাম অনুসারে তাহাকে নূরনগর আখ্যা প্রদান করেন। এইরূপে নূরনগর পরগণা সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রধান নগরী নূরনগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অধুনা সেই স্থান কসবা নামে পরিচিত। মোগল শাসনকর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ স্বীয় সহচর, কায়স্থ জাতীয় রামধরকে নূরনগরের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত করেন। চৌধুরী রামধর নূরনগরে তালুকদারি প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় মোগলগণ ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে কতকগুলি মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক মোগলদিগের হস্ত হইতে সরকার উদয়পুরের উদ্ধারসাধন করেন। কিন্তু অন্যান্য পরগণাগুলি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

ত্রিপুরার আবৃত-ইতিহাস ঃ ইংরাজ-পর্ব

কৃষ্ণপদ দত্ত

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বৃটিশের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এই তারিখে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে ত্রিপুরার মহারাণী বিজেন্টের স্বাক্ষরযুক্ত এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরাজের বিরক্তিকর হস্তক্ষেপের উল্লেখ করা হয়।

১৯২৮ সালে Indian States Enquiry Committee-র কাছে ত্রিপুরা রাজ সরকারের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপিতে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতে সম্ভাব্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরাজদের অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপের বিস্তৃত বিবরণ ও নজীর উল্লেখপূর্বক ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের হস্তক্ষেপের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য ইংরাজ সরকারকে অনুরোধ করা হয়। দলিলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

উক্ত স্মারকলিপিতে রাজ্যের সীমা এবং স্বাধীন রাজ্য হিসাবে রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার রাজনৈতিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহারাজ ও রাজসরকারের প্রতি ইংরাজদের উদ্ধত ও অসম্মানজনক আচরণের একাধিক নজীর উল্লেখ করা হয়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলি তুচ্ছ ও সাধারণ মনে হলেও এদেশে ইংরাজ শাসনের অপকীর্তির নিদর্শন হিসাবে ইতিহাস আলোচনায় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইংরাজ ও রাজ পুরুষদের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎকার উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পান ও আতর বিনিময়ের রীতি প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতে কে কখন কাকে প্রথম পান ও আতর দিয়ে আপ্যায়িত করবেন সে বিষয়ে খুঁটিনাটি উল্লেখ ছিল। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে তদানীন্তন বড়লাটের এক সাক্ষাৎকার ঘটে। রীতি অনুযায়ী সাক্ষাতের শেষে মহারাজ কেবল মাত্র বড়লাটকে পান ও আতর দানে আপ্যায়িত করেন। ইংরাজ রাজ পুরুষদের আত্মাভিমানে এতে আঘাত লাগে কারণ মহারাজ উপস্থিত অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীকেও অনুরূপভাবে আপ্যায়িত করবেন এটাই এদের আশা ছিল। পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ বার্টলির স্বাক্ষরযুক্ত ১১ই জুন,

১৯১৭ তারিখে একটি পত্রে ইংরাজ সরকারের অসন্তোষের কথা মহারাজকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার রাজাদের চিরাচরিত মাণিক্য উপাধির ব্যাপার নিয়ে ইংরাজদের আপত্তি এবং এ সম্পর্কে বাদানুবাদ মহারাজের প্রতি বৃটিশ সরকারের অসৌজন্যমূলক আচরণের আরও একটি নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালে প্রাদেশিক গভর্ণরের আগরতলা আগমন উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের পলিটিক্যাল বিভাগ থেকে একটি খসড়া ভ্রমণসূচী তৈরী করে যথারীতি পাঠানো হয়। উক্ত ভ্রমণসূচীতে যেখানে যেখানে মহারাজের নামের সঙ্গে মাণিক্য বাহাদুর উল্লেখ ছিল সে সব জায়গায় মাণিক্য বাহাদুর কেটে রাজা বসানো হয়। এই এক তরফা পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ হিসাবে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ তারিখের চিঠিতে বার্টলি মন্তব্য করেন — **I have changed the words 'Manikya Bahadur' to "Raja" as the later is the only recognised official appellation of His Highness.** ত্রিপুরার ইতিহাসের সঙ্গে যাদেরই পরিচয় আছে তারাই জানেন বার্টলির কথা কত অসত্য কারণ স্বয়ং ইংরাজ সরকারের বহু দলিল ও চিঠিপত্রে মাণিক্য বাহাদুর উপাধির উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সমগ্র ইতিহাস ইংরাজ শাসকদের অশিষ্ট আচরণ ও মিথ্যা ভাষণের অসংখ্য নিদর্শনেব কলঙ্ক বহন করছে। দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের প্রতি ইংরাজদের মনোভাব বাহ্যতঃ যাই হোক এবং সার্বভৌম সরকারের প্রতি রাজারা যতই আনুগত্য প্রকাশ করে থাকুন, ছোট বড় কোন দেশীয় রাজাই ইংরাজদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পাননি। এ নিয়ে এদেশে ইংরাজ শাসনের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রিত রাজন্যবর্গের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'রাজন্য মণ্ডল' থেকে মাঝে মাঝেই প্রতিবাদ এবং দাবী-দাওয়া উঠেছে। বলা বাহুল্য এই দাবী দাওযা ততটুকুই ইংরাজরা গ্রাহ্য করেছেন যতটা ভারতীয় জনসাধারণেব ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সাম্রাজ্যের স্বার্থেই স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজনবোধ করেছেন।

বীরেন্দ্র কিশোরের পূর্বতন মহারাজ রাধাকিশোরের প্রতি ইংরাজদের বিরূপ মনোভাব সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধাকিশোরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, কবিগুরুর পরামর্শে সুপরিচিত স্বদেশীওয়ালাদের উচ্চতম রাজকার্যে নিয়োগ, আদর্শবাদী স্বাধীনচেতা মহারাজের উৎসাহ ও আনুকূল্যে রাজ্য প্রশাসনে বিভিন্ন সংস্কার প্রয়াস — এক কথায় বাংলার নবজাগরণের ভাবধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে রাধাকিশোরের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ইত্যাদি কারণে তিনি ইংরাজদের দৃষ্টিতে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মহারাজের অন্তরঙ্গতা ইংরেজরা স্বভাবতঃই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তথাপি একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরাজদের নীতিহীন হস্তক্ষেপের সূত্রপাত রাধাকিশোরের সময় থেকেই ঘটেনি। ত্রিপুরায় ইংরাজদের আধিপত্য বিস্তারের ঐতিহাসিক পটভূমি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জীর বিবরণ অনুসারে ঃ In 1761 the contumacy of Kishen Manik ......led to the last phase in the history of the Kingdom.

এ সম্পর্কে কৈলাস সিংহ লিখেছেন ঃ "চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ উপলক্ষে ফৌজদার মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের সহিত ভীষণ কলহ উপস্থিত করিলেন। সেই কলহ হইতে ক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হইল।" ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তারের গোড়ার দিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরাজরা যে চতুর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ফৌজদারের সাহায্যার্থ তদানীন্তন নবাব ইংরাজদের শরণাপন্ন হন। ত্রিপুরার উর্বর ও সমৃদ্ধ সমতল ভূমির প্রতি ইংরাজদের লুব্ধ দৃষ্টি ইতিপূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ততদিনে বিশাল ভারতবর্ষে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রকট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করে মেকেঞ্জী লিখেছেন ঃ "On the 20th January of that year (1761), Governor Vansittart, representative of the Company, now entering on its strange career of empire, writes from Calcutta to the President and Council of the Factory at Islamabad as follows : "With regard to the Tipperh Rajah as the Nawab's Foujdar has been obliged from his ill behaviour to take up arms against him, we desire that you will use your endeavours to reduce him to his due state of obedience to the Government of Islamabad, acquainting us then what advantage may accure to the Company from the possession of that country, and we will answer any representation the Nawab may make on the subject." লেফ্‌টেনান্ট মেথুজ-এর নেতৃত্বে এই সামরিক অভিযানে ইংরাজরা জয়ী হয়। ত্রিপুরা প্রদেশের মোট আয়ের হিসাব গ্রহণ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবীর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে জনৈক কালেক্টরকে পাঠান হয় ঃ The collector found the province desolated by the Nawab's troops and was compelled to take payments by instalment as the Rajah was very low in cash. প্রথম বৎসরের জন্য এক লক্ষ সিক্কা টাকা রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হয়। R. Leeke ত্রিপুরায় প্রথম রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন।

ত্রিপুরার ইতিহাসের সাম্প্রতিক অর্থাৎ ইংরাজ-পর্বে লিকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চতুর ও বিবেকহীন ইংরাজ কর্মচারী একমাত্র তরবারীর ঝঙ্কার ছাড়া অন্য কোন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রধানতঃ তারই প্ররোচনায় কৃষ্ণ মাণিক্যের পরবর্তী রাজা রাজধর মাণিক্য বার বার ইংরাজদের হাতে নিগৃহীত ও অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করেছিলেন। ত্রিপুরায় ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তারের সূচনা এবং এই অধ্যায়ের কলঙ্কিত

ইতিহাসের পূর্ণ ও প্রামাণ্য বিবরণ আজও লেখা হয় নি। মেকেঞ্জীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজধর মাণিক্য একদল ডাকাতকে আশ্রয়দানের অপরাধে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ১৮৩৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার J. J. Harvey-র কাছে প্রেরিত ডেপুটি গভর্ণরের একটি আদেশে রাজধর মাণিক্যের গ্রেপ্তারের বৎসর ১৭৮৪ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধর মাণিক্য অবশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন বলে কৈলাস সিংহের রাজমালায় যে উল্লেখ রয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি কি তা জানার উপায় নেই। পক্ষান্তরে ত্রিপুরার কালেক্টর ১৭৯২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বোর্ড অব রেভিনিউর সভাপতি ও সদস্যদের যে পত্র লেখেন তাতে প্রসঙ্গক্রমে রাজধর মাণিক্যের গ্রেপ্তারের উল্লেখ করে বলা হয় ঃ I must here observe that there are no records in the office relative to the trial of the Rajah nor any reasons assigned for his release from confinement.

প্রসঙ্গত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বোর্ড অব রেভিনিউর কাছে লিখিত কমিটির পত্রে রাজধর মাণিক্য সম্পর্কে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা প্রদেশের অবস্থা এবং বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের বকেয়ার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখপূর্বক উক্ত পত্রে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়ঃ "With respect to the present year we are informed that there was a great desertion of the Rayots, partly owing to the increase, and to an apprehension that they were to be taxed to defray the expenses of the Rajah's nephew during a residence of two years in Calcutta, part of which time he was in goal."

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৭৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে কমিটির অপর একটি কার্য বিবরণী থেকে একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

"The Acting President informs the Committee that the nephew of the Rajah of Tipperah who attended at the begining of the year for the purpose of making the settlement is now in Calcutta, he proposes to the consideration of the Committee his being called up to give security for his own good behaviour and that of the Rajah and that in default of doing it he be put in confinement."

এই স্থলে প্রশ্ন হল ঃ মেকেঞ্জী উল্লিখিত চট্টগ্রামে বন্দী থাকা ছাড়াও হতভাগ্য রাজধর মাণিক্যকে কি ইতিপূর্বে আরও এক বা একাধিকবার ইংরাজের প্রতিহিংসার ফলে কোম্পানীর কারাগারে যেতে হয়েছিল? দুর্ভাগ্যক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির অভাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

রাজধর মাণিক্যের প্রতি ইংরাজদের আক্রোশমূলক মনোভাবের প্রকৃত কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের প্রতি ইংরাজদের লোভের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সমগ্র প্রদেশে তৎকালীন অরাজক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা দলে দলে নিজেদের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়কার সরকারী নথিপত্রে রায়তদের এই ব্যাপক বাস্তুত্যাগের উল্লেখ রয়েছে। এই অবস্থায় রাজস্বের হার বৃদ্ধি এবং বকেয়া রাজস্বের জন্য ইংরাজদের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি স্বভাবতঃই ত্রিপুরাধিপতির বিরক্তির কারণ হয়েছিল। ইংরাজদের অভিযোগঃ কোম্পানীর দাবীপূরণে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য স্বয়ং ইচ্ছুক হলেও কুমার রাজধর মাণিক্যের প্ররোচনায় তিনি ইংরাজ কালেক্টরের পরোয়ানা বার বার অগ্রাহ্য করার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিলেন।

রাজধর মাণিক্যের উল্লেখ করে কমিটি অব রেভিনিউর ২৪শে মার্চ, ১৭৮২ তারিখের কার্যবিবরণীতে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয় ঃ

"A nephew of the Rajah who attended for the purpose of making the late settlement is now in Calcutta and has offered in the Rajah's name to pay up a part of the balance immediately and give security for the revenues in future upon the express condition of the recall of the Resident."

মহামান্য কোম্পানীর অমিত প্রতাপশালী প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে নেবার শর্তে বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার যে প্রস্তাব ত্রিপুরার রাজার পক্ষে রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে রাজধর মাণিক্য করেছিলেন তাতে ইংরাজদের ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

রাজধর মাণিক্যের তথাকথিত বৈরী আচরণ সম্পর্কে কমিটির সদস্যবৃন্দকে অবহিত করে এবং ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সামরিক বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রার্থনা করে লিক সাহেব যে একাধিক পত্র পাঠিয়েছিলেন ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখের একটি দীর্ঘ পত্রে লিক ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ঃ

"The Rajah has for some time past been collecting Burkundauzes from all quarters, and I am assured has not less than two thousand of them at Agurtulla exclusive of the Hill people, and perties that he was stationed at different places in the Hills who are prepared to do every mischief they can to the Province. These preparations he alleges have been made in consequence of the Cookeys......having committed ourtrages upon his subjects in the Hills, but it is evident from the measures he has

adopted that these forces are assembled, if not to act offensively against Government, to oppose any measures that may be taken to compel the payment to his arrears."

কয়েক দিনের মধ্যে ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আর একটি পত্রে বলা হয় ঃ

"The roads to Agurtulla by land have long since been barricaded and I understand the nephew makes no scruple to declare, he will oppose any force that may be sent to apprehend Rajah or him."

সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে চট্টগ্রামের প্রশাসক রিচার্ড সামনারকে লিখিত ১৮ই জানুয়ারী তারিখের পত্রে লিক লেখেন ঃ

"I have received intelligence from the Sootabordar who carried my Perwannah to bring Rajah to Comilla, that he and the people with him are confined at Agurtulla by order of the Rajah without whose permission no one is permitted to return from thence."

লিক সাহেবের প্রার্থনা মঞ্জুর ক্রমে কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরাস্থ রেসিডেন্ট, চট্টগ্রামের অস্থায়ী গভর্ণর এবং ঢাকার মুখ্য প্রশাসকের নিকট যে আদেশনামা প্রেরিত হয় তাতে অন্যান্য নির্দ্দেশের সঙ্গে বলা হয় ঃ

"We direct that you do not attempt to apprehend the Rajah at present unless guilty of some public disturbance or the force now levying by him should act offensively against you, or attempt to plunder the Province in which case you will direct the officers sent with the detachment from Chittagang to attack them and apprehend as many as possible as well as the Rajah and his nephew."

ত্রিপুরার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজধর মাণিক্য নিঃসন্দেহে অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে প্রবল ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার পক্ষে কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগঠিত করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তথাপি ইংরাজদের নথিপত্রের বিবরণ থেকে রাজধর মাণিক্যের বীরত্বের যে চিত্র সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় তার সঙ্গে লিক বর্ণিত বিবরণের যেন ঠিক মিল পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরাজদের হস্তক্ষেপের আরও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেবার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। এ বিষয়ে আরও গভীর

অনুসন্ধান ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস লেখকদের দৃষ্টি এদিকে আরও বেশী নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ইংরাজ আগমনের ফলে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের জনজীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। কৃষির অবনতি ছাড়াও এখানকার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। "১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাদবা ও চরপাতা নামক স্থানে দুইটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন। ত্রিপুরার পর্বতজাত কার্পাস নির্মিত বাপ্তা বস্ত্রের বাণিজ্যই উল্লিখিত কুঠি স্থাপনের অভিপ্রায়। অন্যূন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইত। এই বাপ্তা বস্ত্রের দালালী দ্বারা লৌহগাড়ার সাহা পরিবার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে ইঁহারা দ্বিতীয় জগৎ শেঠ বলিয়া পরিচিত হন। বিলাতী শিল্পীগণ আমাদের বাপ্তা বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।" (কৈলাস সিংহ)

বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার মত ত্রিপুরায়ও ইংরাজরা নীল চাযের প্রবর্তন করেছিলেন। Hunter-এর Statistical Account of Bengal- এ এই সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"The opposition to the industry on the part both of the neighbouring Zamindars and of the planters' tenants was so desperate that none of the factories could hold out against it."

কৈলাস সিংহের মতে "নীলকরের অত্যাচারকালে ত্রিপুরাবাসীগণ যেরূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে বাংলার অন্য কোন জেলার লোক তাহা দেখাইতে পারে নাই।"

ত্রিপুরায় ইংরাজ শাসনের গোড়ার ইতিহাস আজও প্রধানতঃ অজ্ঞাত। নীলকরের অত্যাচার ছাড়াও লবণ মহালের উৎপীড়ন এককালে সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। এই শোষণ ও অত্যাচারের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হলে অনেক রক্ত, স্বেদ ও অশ্রুর বিষাদক্লিষ্ট কাহিনী নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হবে।

ত্রিপুরার আদিবাসী লোকসঙ্গীত

মহেন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরার আদিবাসীদের নিজস্ব সঙ্গীত আছে যা অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসীদের মতই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে লিখিত আছে, নৃত্য গীত বাদ্য এই তিনের সমন্বয়ে সঙ্গীত। সে মর্মার্থে ত্রিপুরার আদিবাসীদের মাঁছামুং (নৃত্য), রাঁচামুং (গান) তামমুং (বাদ্য) থাকায়, একেও সঙ্গীত বলা যায় বৈকি! ত্রিপুরী লোকসঙ্গীতের সুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কয়েকটি রাগরাগিণীর ছায়া প্রকাশ পায়। হুবহু নয়। সে রাগ কয়টি হচ্ছে সারং, মধুমন্তী, জৌনপুরী, মেঘ, ভূপালী ইত্যাদি। তার অর্থ এই নয় যে, আদিবাসীরা ঐসব রাগরাগিণী কারো কাছে শিখেছে, নকল করেছে বা ধার করেছে। আদিবাসীরা তাদের গোষ্ঠী গঠনের সময় থেকে, নিজেদের তৈরী নিজস্ব সুরে গান গেয়ে আসছে। আজও গায়। ঐ সুরের গীত গানই ট্রেডিশনাল সঙ্গীত। আদিবাসী লোকসঙ্গীত সাধারণতঃ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হাংকরের (অঞ্চল) নামে পরিচিত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও এমন দেশজ নামের পরিচয়ে পরিচিত। যেমন, ভূপালী, জৌনপুরী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী ইত্যাদি। ত্রিপুরী বা তিপরা বারদ, এর মধ্যে লক্ষপতি, দুনা, বেরি সর্বং, উতুইরা, দখিন্যা ইত্যাদি। গোষ্ঠী নামে, যেমন রিয়াং, কলই, মলছম, কাইপেং, রূপিনী, হালাম, কুকি, চাকমা ইত্যাদি।

আদিবাসী গানের সুর সাধারণতঃ ৪/৫টি স্বরকে কেন্দ্র করে আরোহণ অবরোহণ করে থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঔরব খারব রাগের মত। স্বর ব্যবহার হয়, স' গা মা পা নি। সা-তে এসে বিশ্রাম নেয়। কোন কোন সময় উদারা গ্রামের 'নি' কে প্রকট করে। আদিবাসী লোকসঙ্গীত কথা প্রধান গান। সুর এখানে গৌণ। গানের সুর মুদারা — গ্রামের ''নি'' স্পর্শ করে ফিরে আসে। ''এহো হু'' স্বরে বাহার দেওয়ার সময় তারা গ্রামের ''সা'' পর্যন্ত যায়। তখন গানটি সম্পূর্ণতার প্রাপ্ত রসে বঞ্জিত হয়। গায়ক গায়িকারা সাইন্দা বাদ্যযন্ত্রকে অনুসরণ করে গান গায় বলে তাদের কণ্ঠে স্পর্শ উত্তোলন বা কৃন্তনের কাজ বেশী। ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবন জুম নির্ভর। সারাবছর জুম চাযকে কেন্দ্র করেই তাদের সময় কাটে। গান আছে, ''বিছি সুপুংগীই তাংছিনি তাংগীই তাংছিনি তাংগীই বহগছে পুলাংলিয়া'' অর্থাৎ বছরভর জুমে সাত বার কাজ করেও আমাদের পেট ভরেনা। এই জুমিয়াদের গান তাল বর্জিত। কারণ জুমে ঢোল নিয়ে সঙ্গদ করার সুবিধা থাকে না। আদিবাসী জুমিয়াদের গান কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজ এবং গান এক সঙ্গেই চলে। এতে শ্রম লাঘব হয়, সময় কাটে এবং মনের কথা মনের মানুষের মধ্যে

দেয়া নেয়া চলে।

উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি গড়ে উঠে এ উক্তি যে নির্ভুল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জুমিয়া গান। জুমের কাজ চলছে। সঙ্গে সঙ্গে গাইছে ''নীনি আরিবাই আনি অরিঅ মায়ছুই তমছা পিনদি। মায়ছুই তমছা ফায় থানি থানি, য়াগ বই য়াগ মালায় নানি।'' অর্থাৎ তোমার (জুমের) সীমানায় কাওয়ান বীজ ছাড়াও ফসল যখন ফলবে তখন হাতে হাত ছোঁয়াও। কোনও প্রেমিকা দুঃখ করে প্রেমিককে জানাচ্ছে ''দংগ লুবিয়া কীফানাই মাইয়া নবার বুবাগীরানি বাগীই। প্রাণ যাদু বাই কীথাই মাইয়া আমা আফানি বাগীই।।'' অর্থাৎ লতার অবলম্বনার্থ দেওয়া বাঁশে লুবিয়া লতা জড়াতে পারেনা পবন রাজার (বৈরী) জন্যে। মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়না (বৈরী) মা বাবার জন্যে। এমন আরো হাজারো গান আছে।

গীত বাদ্য নৃত্য মিলে সঙ্গীত। ত্রিপুরার আদিবাসীদের নৃত্য সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। আদিবাসী লোক নৃত্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সঞ্জাত। এ নৃত্য কাউকে দেখাবার জন্যে, খুশী করার জন্যে নয়। এ নৃত্য কাজের সঙ্গে জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা যারা জানেন তারা ত্রিপুরার ''মছক বুমানি'' মানে হরিণ শিকারের নৃত্যটি দেখলে বুঝতে পারবেন, এ নৃত্যের সৃষ্টির উৎস কোথায়। বিবর্তনের পথে মানুষ যখন প্রস্তরযুগে পৌঁছল, তখন তাদের শিকারী জীবন আরম্ভ হয়। ম্যামথ হাতি ইত্যাদি জীবজন্তু শিকারে যাওয়ার আগে গুহাগাত্রে ঐসব জীবজন্তুর ছবি এঁকে, কিভাবে মারবে তার রিহার্সেল দেয়, উদ্দামভাবে লম্ফঝম্ফ দিয়ে, গোটা গোষ্ঠী মিলে, যৌথভাবে। এটাই পরবর্তী কালে নৃত্য নামে পরিচিতি লাভ করে। ''মছক বুমানি'' নৃত্যটাও সেই নৃত্যের ইতিহাস স্মরণ করায়।

নৃত্যশিল্পীদের কারো হাতে দা, কারো হাতে বর্শা থাকে। নাচের গান চলে ''তানতুই তানুতুই তানয়াতুই তানলায় মছক থুই। ছাকীই ছাকীই ছাকয়াতুই ছাকীলায় মছক থুই।'' মানে কাটবো কাটবো, এভাবে কাটলেই হরিণটা মরবে। যাদের হাতে দা আছে, তারা বলছে, ঘাই মারবো ঘাই মারবো ঘাই মারলেই হরিণটা মরবে। নৃত্যের মুদ্রা জ্ঞান না থাকলে যেমন শাস্ত্রীয় নৃত্যের রস উপলব্ধি করা যায় না; তেমনি পশুপাখীর নাচন কুদন আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে গরিয়া নৃত্যের রস উপলব্ধি করা যাবে না। গরিয়া নাচে তারা নাচে, তৃকুমানি (স্নান করা),খুম তুইছা খলমানি, ওয়াটার লিলি ফুল চয়ন করে খোপায় পরে। তকছা আদা চারিমানি, পাখী কিভাবে তার বাচ্চাদের খাবার খাওয়ায় তকছা তিতুং জাং রিমানি, পাখী কিভাবে তাদের লেজ নাড়া দেয়। মীখরা বুকাং জাংরি মানে বানর কিভাবে গাছ ঝাঁকি দিয়ে ভয় দেখায়। হাতি কিভাবে উল্টা দিয়ে উলুর ঢিবি ভাঙ্গে, এইসব ভঙ্গি আদিবাসী নৃত্য শিল্পীরা প্রদর্শন করে। রিয়াং সম্প্রদায়ের হজাগিরি নৃত্য ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য নৃত্য। মলছম সম্প্রদায়ের হইহাগ নৃত্যও দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জমাতিয়া ছাড়া আর প্রায় সব সম্প্রদায়েরই নিজস্ব নৃত্য আছে- যা তারা তাদের গোষ্ঠী গঠনের যুগ থেকে নেচে আসছে আজও নাচে। সম্প্রদায়ের নামেই নাচ গানের নাম হয়। যেমন, কলই নাচ গান, রূপিনী নাচ গান,

নোয়াতিয়া নাচ গান ইত্যাদি। ত্রিপুরার আদিবাসী লোক নৃত্য বললে, গরিয়া, লেবাং বুমানি, হজাগিরি, হইহাগ, মছক বুমানি, আথুক বমনানি, মাতিয়া, বিজু, বাঁশ নৃত্য, জুম নৃত্য ইত্যাদিকেই বুঝায়।

ত্রিপুরার আদিবাসী লোক সঙ্গীত বলায়, লোক গীত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেল। এবার লোক বাদ্য সম্পর্কে কিছু বলছি। আদিবাসীদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র আছে। যার নাম খাম, সাইন্দা, সুমু, মুরি, দাংদু, চংপেরেং, উআ খরপ, উআফংফাং, তৃফতুতুরুক ইত্যাদি। এখন ঐসব বাদ্যযন্ত্র তৈরী করার কারিগরও নেই, বাজাবার শিল্পীও নেই। এখন শুধু সাইন্দা সুমুই বাজে। চংপেরেং দাংদু মাঝে মাঝে শুনা যায় মাত্র। দক্ষ শিল্পী নেই।

আদিবাসী লোকবাদ্য ''খামকতর''-এর তাল বোল আছে ২/২/৩/৩ বা ৪/৪ আঘাতে বিভক্ত। বোল হচ্ছে ''গানকি গাগান, গিচন গান্, চন্ গান্, গান্ গিচন্, গিচন চুগান, গিচন গান, গানকি গাগান গিচন। তেহাই চন গান গান, চুগান গান গানি চনে গান গিচন। এই বোলে তাল বাজে গরিয়া নৃত্যের সময়। মামিতা নাচের সময় যে বোলে তাল বাজে তা অনেকটা তেওরা তালের মত।

আদিবাসী শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্রে সাধারণতঃ জীবজন্তু পশুপাখীর শব্দ অনুকরণ করতে দেখা যায়। যে শিল্পী পশুপাখীর ডাক নিখুঁতভাবে সাইন্দা বা বাঁশীতে তুলতে পারে সেই বড় উস্তাদ। সে জন্যেই বলছিলাম আদিবাসীদের নৃত্য গীত বাদ্য আছে সুতরাং এটাকে সঙ্গীত বলা যায়। যদিও লোকসঙ্গীত, তবু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যানুযায়ী এও সঙ্গীত।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথ

স্বপন সেনগুপ্ত

'ভগ্নহৃদয়' ছিলো নাটকাকারে লিখিত গীতিকাব্য। বিলাতে এই কাব্যের পত্তন হলেও, কিছুটা ফেরার পথে এবং বাকীটা দেশে ফিরে, শেষ করেছিলেন কবি। ১২৮৭ সালে 'ভারতী'র কার্তিক থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রথম ৬ সর্গ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় এবং শেষে ১২৮৮ সালের প্রথম দিকে ছাপা হয়ে বের হয় পুস্তকাকারে।

গ্রন্থ প্রকাশের বারো বছর পর এক পত্রে গ্রন্থ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা ছায়া।'

তখন ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র প্রৌঢ়। প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী ভানুমতী দেবীর অকাল প্রয়াণে শোকাকুল। বিরহীর মর্মবেদনাকে তখন গেঁথে রাখছেন কবিতার খাতায়। এমনি সময় হাতে পেলেন কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়'। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র গ্রন্থটি পড়ে যেন নিজের হৃদয়ের কথাই অনুভব করলেন ছত্রে ছত্রে। রবীন্দ্রনাথের তখনকার কাঁচা লেখার মধ্যেও বিশ্ববিমোহন কবি প্রতিভার প্রথম সূচনা আবিষ্কার করেছিলেন বীরচন্দ্র। যদিও ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুর পরিবারের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলনা বীরচন্দ্রের। 'ভগ্নহৃদয়' পাঠে মহারাজ মুগ্ধ, বিমোহিত — একথা কবিকে জানাতে বীরচন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পাঠালেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে।

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন : 'মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির কাব্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যেই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।'

মহারাজ বীরচন্দ্র প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরে শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়েনা তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন'।

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সখ্যতার এই হলো আদি সূত্র। এর আগে বীরচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ... রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রিন্স দ্বারকানাথ



ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন কলকাতায়। এবং দ্বারকানাথের সহায়তায় সে যাত্রায় সফলকাম হয়ে ফিরে এসেছিলেন ত্রিপুরায়। সে সূত্রেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের প্রথম পরিচয়। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ যোগাযোগের আগেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল কর্ণেল মহিম ঠাকুরের। বিগত শতাব্দির আশির দশকে কলকাতায় মহিম ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতৃস্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সুবাদে মহিম ঠাকুরের অবাধ যাতায়াত ছিল ঠাকুর পরিবারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় সেই কিশোর বয়সেই। বাংলায় প্রকাশিত নতুন নতুন গ্রন্থ মহারাজ বীরচন্দ্রের কাছে পৌঁছানোর ভার ছিলো কিশোর মহিম ঠাকুরের ওপর। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এ মে পৌঁছে যায় বন্ধুত্বে। বীরচন্দ্র মাণিক্যকে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি মহিম ঠাকুরই পরিচয় করিয়ে থাকবেন সম্ভবত। পাঠ শেষে মহিম ঠাকুর যোগ দিয়েছিলেন বীরচন্দ্রের দরবারে। মহারাজ যখনই কলকাতায় যেতেন, তখনি ডেকে আনতেন রবিবাবুকে। কবির কণ্ঠে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনতে বড় ভালোবাসতেন তিনি। পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচের প্রাথমিক জড়তা কেটে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ (১৮৯৪ খ্রীঃ) কার্সিয়াং যাবার কালে, সঙ্গী করে নিয়েছিলেন কবিকে। অনেক রাত পর্যন্ত চলতো দু'জনের কাব্য ও সঙ্গীতের আলোচনা। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশের সংকল্প কীভাবে কার্যে পরিণত করা যায়, এ নিয়েও আলোচনা চলতো দু'জনের। আলোচনার শেষে প্রতি রাতে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন কবিকে। রুগ্ন শরীর নিয়ে এভাবে এগিয়ে দেওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুযোগ জানালে মহারাজ বলেছিলেন রবিবাবু পাছে অলসতা আসিয়া কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না উত্তর শুনে রবিবাবু বলেছিলেন, 'আমি অভিজাত বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম'

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ত্রিপুরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্যতম কারণ। 'এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।' বাংলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনুরাগের কথাও মনে হয় কবির জানার সুযোগ হয়েছিল কৈলাশচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' আলোচনা ও প্রণয়ন কালে। ১২৫৮ - ১৩২১ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন কৈলাশচন্দ্র। 'রাজর্ষি' এবং 'মুকুট' সম্বন্ধীয় ত্রিপুরার ঐতিহাসিক আখ্যানগুলো কবি সংগ্রহ করেছিলেন কৈলাশচন্দ্রের সহযোগিতায়। ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' বর্ণিত মহারাজ অমরমাণিক্যের একটি আখ্যানের ছায়া অবলম্বনে 'বালক' পত্রিকায় (১২৯১ ৯২) 'মুকুট' গল্পটি প্রকাশিত। পরবর্তী সময়ে ১৯০৮ ডিসেম্বর মাসে নাট্যরূপ দেওয়া হয় 'মুকুট' গল্পটির।

২৩ বৈশাখ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ কবি বীরচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'আপনাদের রাজ পরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব হইতে পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই সেইজন্যই সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্বকার সম্বন্ধ মহারাজের

স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।'

'রাজর্ষি'-র রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজনেই এই ঐতিহাসিক চিঠির অবতারণা। বীরচন্দ্রও লিখেছিলেন ঃ ...... 'সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই, আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম।'

১২৯৭ বঙ্গাব্দে রাজর্ষির প্রথমাংশ নিয়ে কবির 'বিসর্জন' নাটক প্রকাশিত। বীরচন্দ্র উদয়পুরের তদানীন্তন ফটোগ্রাফ, রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্য ও তার ভাই ছত্রমাণিক্যের চরিত মুদ্রাঙ্কন শেষে কবিকে পাঠিয়েছিলেন।

কার্সিয়াঙে ১৮৯৬ খ্রীঃ মহারাজার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বার। সেবার লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ছাপাখানা কিনে সেই ছাপাখানা থেকে কবির কাব্য গ্রন্থের অলঙ্কৃত সংস্করণ প্রকাশের অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন বীরচন্দ্র। কিন্তু সে বছরই কলকাতায় মহারাজের মৃত্যু ঘটে।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর যুবরাজ রাধাকিশোর রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব থেকেই পারিবারিক নানারকম জটিলতা, গৃহবিবাদ, রাজ্যের দাবি-দারিতে মামলা মোকদ্দমা এবং উপযুক্ত বিশ্বস্ত, রাজ কর্মচারীর অভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল উত্তপ্ত। বিব্রত মহারাজ রাধাবিশোর তখন আগ্রহী হলেন কবির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে। সম্ভবত ১৮৯৬ সালে কলকাতায় রাধাকিশোরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে, ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক বুঝি ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর আশঙ্কার পরিচয় মেলে, 'মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ-সূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হলোনা সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর (বীরচন্দ্রের) অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহার্দ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন।'

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কবি প্রথমবার ত্রিপুরায় এলেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর সময়ে। রাধাকিশোর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮৯৭ সালের ৫ মার্চ। অভিষেকের ৭দিনের মধ্যেই এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ সহ বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতিও তখন করুণ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চলছে নানা জটিলতা। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ২৬ মাঘ বীরেন্দ্রকিশোরকে মহারাজ যুবরাজ পদে নিযুক্ত করলে বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র দেববর্মা নালিশ জানালেন ইংরেজ রাজ দরবারে। মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াল। বিব্রত রাঁধাকিশোর স্বাভাবিক ভাবেই সে সময় কাছে পেতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের বংশ মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিলো রাধাকিশোরের। রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার রাজার হিতাহিতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে। সেজন্য বহু কটু মন্তব্য, গঞ্জনা ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল কবিকে।

১৩০৬ সালে কবির সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল কুঞ্জবনের উঁচু টিলায়, বাঁশ দিয়ে তৈরি টংঘরের অনুরূপ মঞ্চে বসন্তোৎসবের মাধ্যমে। সেবার রাজ অতিথি কবিকে রাখার

বন্দোবস্ত হয়েছিল কর্নেল মহিম ঠাকুরের বাড়িতে। সেদিন সম্বর্ধনানুষ্ঠানে প্রাকৃতিক সমারোহ এবং মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কবিকে মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। এরই স্মৃতি অনুভব করা যায় 'কাহিনী' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে। মহারাজ রাধাকিশোরের নামে কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজনীতিক ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন সম্ভবত প্রৌঢ় রাজা বীরচন্দ্রের মহৎ হৃদয়ের কোমল স্পর্শের প্রতিদানে। সমরেন্দ্র দেববর্মা যখন রাধাকিশোরের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত, কবি তখন রাজার হয়ে কলকাতায় প্রভাবশালী মহলে জনমত গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। ফলে বড়ঠাকুর কোথাও কোনো আমল পেলেন না। এমন কি 'Englishman' পত্রিকাও বড়ঠাকুরকে সমর্থন করলো না। উচ্চ আদালতে রায় গিয়েছিল রাধাকিশোরের পক্ষে। কিন্তু আমরা বিস্মিত এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবি রাজসিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন কিভাবে? রাধাকিশোর-রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ের বড় অংশই রাজনৈতিক জটিল আবর্তে আলোড়িত। রাজ্যের মঙ্গল চিন্তাতেই কবি সেসময় ছিলেন সর্বদা উদ্বিগ্ন। রাধাকিশোরের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ক্রমে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শীতকালে কলকাতায় অভিজাত 'সঙ্গীত সমাজ' মহারাজকে সম্মানিত করার জন্য এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে— কবি রাধাকিশোরের প্রশস্তিতে 'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা/ ত্রিপুর পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এই গানটি গেয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মহারাজাকে। ১৩০৭ সালে মহারাজার আমন্ত্রণে দার্জিলিঙে রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কবি।

১৩০৮ সালে কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ মহারাজের আহ্বানে এসেছিলেন আগরতলায়। তখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে মহারাজার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে মহারাজ রাজ্যে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার এবং ভাষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সর্বস্তরে। ১৯০৯ সালের ১২ মার্চ বারাণসীতে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান রাধাকিশোর। রবীন্দ্রনাথ যখন স্থানিক সাহিত্য পরিষদ গঠনের কথা বারবার বলছিলেন, তখন সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাতেই প্রথম রাধাকিশোরের উদ্যোগে 'ত্রিপুর সাহিত্য সম্মিলনী' গঠিত হয় এবং প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগরতলা আসেন ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ়। 'দেশীয় রাজ্য' নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন সেই সভায়। রাধাকিশোরের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ মূলতঃ ছিল ব্রজেন্দ্রকিশোরের (লালুকর্তা) সঙ্গে। রাধাকিশোরের ১২ বছর রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এসেছিলেন পাঁচবার। ত্রিপুরায় মন্ত্রীদের এবং রাজ পরিষদের বিরূপ সমালোচনা নিজের বৃহত্তর কর্মজগতের চাপে কবি ধীরে ধীরে যেন সে সময় ত্রিপুরা থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। ব্রজেন্দ্র কিশোরকে লিখেছিলেন, 'দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় বিরত থাকিব না।'

রাধাকিশোরের মৃত্যুর চার বছর পর ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল পুরস্কার। কিন্তু মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর কবির সম্মানে আনন্দ প্রকাশের কোন উদ্যোগ নেননি রাজ্যে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের সম্মানে আয়োজিত সভায় মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। অবশেষে ১৩২৬ সালে কার্তিক মাসে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে কবি এসেছিলেন আগরতলায়। সেবার কুঞ্জবনে নবনির্মিত বাংলোয় অবস্থান করেছিলেন কবি। রাজা ও কবির মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত শিল্প নিয়ে সেবার ভাব বিনিময় ঘটেছিল নিবিড় ভাবে। রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকিশোরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন ভ্রমণের। কবির অনুরোধে শান্তিনিকতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর পাঠিয়ে ছিলেন নৃত্যশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহ কে। ১৯২৩ সালে ১৩ আগষ্ট দীর্ঘরোগ ভোগ শেষে লোকান্তরিত হন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর।

সে সময় বীরবিক্রমের বয়স ১৪ বছর। ১৯২৮ খ্রীঃ বীরবিক্রম সিংহাসনে বসেন। সঙ্গীতের প্রতি ছিল বীরবিক্রমের সহজাত অনুরাগ। বীরবিক্রমের সময় প্রকৃতপক্ষেই রাজ্যে শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগ। কিশোর বীরবিক্রমের উদার ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। বীরবিক্রমের রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এসেছিলেন মাত্র একবার, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। বীরবিক্রমের বয়স তখন ১৭ বছর মাত্র। ১৯২৬ খ্রীঃ যখন কবি ত্রিপুরায় আসেন ব্রজেন্দ্র কিশোরের আমন্ত্রণে তখন নাবালক রাজার হয়ে রাজ্যে শাসনকাজ পরিচালনা করতো শাসন পরিষদ। ১৩৩২ সনে ১০ ফাল্গুন কবি সপ্তম ও শেষবারের মতো এসেছিলেন আগরতলায়। সেবার ব্রজেন্দ্রকিশোরের পৌরোহিত্যে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'। এই কিশোর সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের সময়। ১৩ ফাল্গুন ১৩৩২ সনে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে কবির সম্মানে আয়োজিত রাসলীলা অনুষ্ঠানে কিশোর বীরবিক্রমের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল প্রৌঢ় কবির। কবি সেদিন মহারাজের সঙ্গে 'রাজমালা' 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে গ্রন্থ দু'টো 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' থেকে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেবার ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল প্রচন্ড ভাবে। ত্রিপুরায় বসেই রচনা করেছিলেন 'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা', 'ফাগুনের নবীন আনন্দে', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'বনে যদি ফুটলো কুসুম' এবং 'আপনহারা মাতোয়ারা' গান পাঁচটি।

মহারাজ বীরবিক্রম ছিলেন কবির একান্ত অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথকে 'ত্রিপুরার কবি' বলে অর্ঘ্যপ্রদান করেছিলেন প্রকাশ্যে। ১৩৪৫ সনে ২২ পৌষ কবির আমন্ত্রণে বীরবিক্রম গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। আম্রকুঞ্জে কবি সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজকে। মহারাজার সম্মানে সেবার 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা। ১৩৪৮ সালে বৈশাখ মাসে কবির অশীতিতম জন্মদিনটি ত্রিপুরায় রাজকীয় মর্যাদায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের খাস দরবারে পালন করা হয়, কবি তখন রোগশয্যায় শায়িত। রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী কমিটির প্রধান সদস্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রাজকীয় দরবারে তাঁর

অভিভাষণে বলেনঃ 'ত্রিপুরা রাজ্য কেন ভারতের অন্য কোথাও সম্ভবত রাজকীয় বিশেষ দরবারে এই প্রকার জন্মজয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হয় নাই। এই বিশিষ্টতা অর্জন করা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করি।'

এরপর এক বিশেষ রাজকীয় রোবকায়ীতে বীরবিক্রমের স্বাক্ষর করা ত্রিপুরার পক্ষে কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান করে কামনা করা হয় কবির শতায়ু। ত্রিপুরা থেকে বিশেষ দূত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ৩০ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবির হাতে এই রাজকীয় মানপত্র তুলে দেন এবং মানপত্র গ্রহন করে ত্রিপুরার জন্য শেষ বাণীতে বলেন, "সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত পদবী দ্বাবা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান কবেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্তমান মহারাজা অত্যাচার পীড়িত বহু সংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। .... এই বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলাম তা সগৌরবে গ্রহন করি।"

২২ শ্রাবণ কবির তিরোধানের সংবাদ বীরবিক্রম অবগত হন বোম্বাই থেকে ব্যাঙ্গালোর যাবার পথে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ত্রিপুবায় সমস্ত অফিস-আদালত বিদ্যালয় বন্ধ রাখার জন্য রাজাদেশের তারবার্তা পাঠান আগরতলায়। ১৮৮২ সালে বীরচন্দ্র অপরিণত প্রতিভার লগ্নে কবিকে জানিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিব সম্মান, আব কবির জীবদ্দশায় শেষ জন্ম জয়ন্তীতে ত্রিপুরাব রাজদরবাব থেকে কবিকে প্রদান করা হয় 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি।

<u>ঋণ স্বীকার</u>

১) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, শিক্ষাদপ্তর প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ।

২) রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা, বিকচ চৌধুরী।

৩) রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য।

৪) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ।

৫) ত্রিপুরা প্রসঙ্গ (সম্পাদনা, স্বপন সেনগুপ্ত)।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতা

অপরাজিতা রায়

ত্রিপুরায় কবিতা রচনার প্রথম লগ্ন চিহ্নিত করার কাজে গবেষণার অনেক অবকাশ আছে। প্রচলিত জনমতের ভিত্তিতে রাজমালাকে মনে করা হয় এ রাজ্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্য তাঁর সভাসদ শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর শর্মাকে ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন; এমন একটা প্রাচীন ধারণা এখানে চলে এসেছে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক ভিত্তি এখনো নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয়নি। রাজমালায় পঞ্চদশ শতকের অনেক পরের ঘটনাও অন্তর্ভূক্ত আছে। এছাড়া ভাষাতত্ত্বের বিচারেও রাজমালার প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে গবেষকদের মতে রাজমালা অষ্টাদশ শতকের আগে রচিত হয় নি।

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৯২৩-৪৭) কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ বিভিন্ন পুঁথির পাট মিলিয়ে রাজমালা সম্পাদনা করে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ''রাজমালা প্রথম লহর'' প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন বলেন, '' রাজমালা ক্রমান্বয়ে ছয় বারে রচিত হইয়াছে। প্রতিবারের রচিত অংশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত সেগুলিকে 'লহর' আখ্যা প্রদান করা হইল।'' কালীপ্রসন্ন সেনেব সম্পাদনায় রাজমালার চারটি লহরে মূল পাঠের চারখন্ড অন্তর্ভূক্ত হয়। এই চারখন্ডে প্রাচীনকাল থেকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিববণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৩০ থেকে ১৭৮৩ খৃ. পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। রাজমালায় এর পরবর্তীকালের রাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের (১৮২৬-২৯) কাহিনী পর্যন্ত পাওয়া যায়। কাশীচন্দ্র মাণিক্যের অধস্তন চতুর্থ রাজা ছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। কাজেই রাজমালা যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার আমলে ক্রমান্বয়ে রচিত হয়েছে, এতে সন্দেহ থাকে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় পাওয়া রাজমালার পুঁথির একটি প্রতিলিপি ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার ১৯৬৭ সালে জুন মাসে মুদ্রিত করে প্রকাশ করে। পুঁথির অবিকল প্রতিরূপ বজায় রাখতে অশুদ্ধ বানান গুলিকে শুদ্ধ না করে যা ছিল তাই রেখে দেওয়া হয়েছে। এই পুঁথির প্রথম দিকেই দেখছি—

''শ্রী ধর্ম্মমাণিক্য নাম ত্রিপুর চূড়ামনি।
দানধর্ম্মে শুচরিত্রে রাজ সিরোমনি।।
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান
ভেদদন্ড ভূমিদান নীতিতে প্রধান।।''

রাজমালার প্রথম লহরে এই ভাষা ধর্ম মাণিক্যের আমলের পঞ্চদশ শতকের ভাষা যে নয়, তা বুঝতে দেরী হয় না।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার উদাহরণ পাওয়া যায় বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৯১৬ সালে প্রকাশিত বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থে।

"যমুনার ঘাটে রাধা বাঁশী নাদ সুনী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আইনের রানী।।
বৃন্দাবনে বাঁশী বাত্র নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চন্ডীদাস বাসলী গণ।।"

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের এ ভাষার সঙ্গে চন্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদ "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম/কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ।" এর কত তফাৎ! পরবর্তী পদ নিঃসন্দেহে ঊনিশ শতকের আগের ভাষা নয়। অথচ তা চলে আসছে চন্ডীদাসের নামে। ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভাষার সময়ের ইতিহাসকে বেশ কিছুটা ধরে রাখে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, রাজমালাকে আমরা যে চেহারায় পাই, তাঁর ভাষা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের সময়ের।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে ত্রিপুরায় আরও কিছু কাব্য লেখা হয়েছে—ত্রিপুরার রাজবংশকে কেন্দ্র করে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে—চম্পক বিজয়, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, সমশের গাজী নামা ইত্যাদি। পয়ার ও ত্রিপদীতে লেখা এসব কাব্যের ভাষা ও আঙ্গিক প্রায় রাজমালার মতই। এসব দিকগুলিও রাজমালার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয় না।

দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের রাজত্বকালের বিবরণ সম্বলিত কাব্য চম্পক বিজয় কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যের লেখকের নাম শেখ মহদ্দিন। মুসলমান কবির লেখা বোধহয় ত্রিপুরার সাহিত্য ইতিহাসে এটিই প্রথম কাব্য। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৬৮৫ থেকে ১৭১২ খ্রীঃ। এর ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে চম্পক বিজয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লেখা।

এরপর আমরা পাই কৃষ্ণমালা ও শ্রেণীমালা কাব্য দুটি। মহারাজ রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭৮৫-১৮০৪) এগুলি রচিত হয় বলে জানা যায়। রাজধর মাণিক্য তাঁর পিতা কৃষ্ণ মাণিক্যের কাহিনী নিয়ে কৃষ্ণমালা রচনা করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই কাব্য দুটির রচিয়তা কে অথবা কারা তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। বনমালী সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থ দুটির লেখক, এমন উল্লেখও পাওয়া গেছে। আবার পন্ডিত রামগঙ্গা মাণিক্য কৃষ্ণমালা রচনা করেন, একথাও কেউ কেউ বলেছেন।

এগুলি সবই ধারাবাহিক ভাবে ত্রিপুরার রাজাদের কীর্তি কাহিনী ও মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত কাব্য। ধরাবাঁধা ছকের বাইরে কেউ যান নি। বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস কাশীরামও রামায়ণ মহাভারত অনুসরণ করে লিখেছিলেন বলে প্রাচীন রাজবংশের বাইরে যেতে পারেন নি। পদাবলী সাহিত্যও দেব মহিমা ও রাজবংশের ঘটনাবলী ঘিরে গড়ে উঠেছে। লেখক কবির

সমকালীন সমাজ থেকে অনেক দূরের পৌরাণিক আলোয় ভাস্বর সে সব লেখা। কিন্তু এর পর বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি মঙ্গল কাব্য কেন্দ্রিক অধ্যায়, যার মধ্যে শুধু রচয়িতার সম সময়ই বিধৃত হয়নি, দেখা দিয়েছে সমাজের সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী। মনসা মঙ্গলের চাঁদ সদাগর, চন্ডী মঙ্গলের ধনপতি শ্রীমন্ত সেই সময়ের বাণিজ্যিক অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। আরও নীচের তলায় দরিদ্র মানুষও এসে দাঁড়িয়েছে মঙ্গল কাব্যে, কালকেতু ফুল্লরার কাহিনীতে। মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী ''ফুল্লরার বারমাস্যা'' লিখে যে অভাবী জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন, এর আগে তা কাব্যের বিষয় হতে পারে বলে কেউ মনে করত না।

''ধীরে ধীরে কহে রামা যত দুঃখ বানী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার ছাউনি।।
ভেরেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।''

পুষ্প গন্ধ, মলয়ানিল, মণি মুক্তা রত্ন ভাণ্ডার সরিয়ে রেখে খেটে খাওয়া মানুষের দিন যাপনের ক্লিষ্ট সংগ্রাম এঁকে রেখেছে ফুল্লরার বারমাস্যা। ত্রিপুরার কাব্য গাঁথায় এ ধরণের কিছু পাই না। অথচ রাজ প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে সাধারণ মানুষের, আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর দিন রাত্রি তো এরকম বেঁচে থাকার যুদ্ধে জর্জরিত ছিল। সেগুলো তুলে ধরা হয় নি ত্রিপুরার তদানীন্তন কাব্যে। মনে হয় রাজানুকূল্যে পুষ্ট কাব্য সাহিত্য একটা নির্দিষ্ট সীমায় আটকে থাকতে বাধ্য ছিল। সামন্ত রাজ্যের কিছু বাড়তি শিকল ঘিরে রেখেছিল কাব্য সাহিত্য-কেও। একটা ব্যতিক্রম অবশ্য চোখে পড়ে ''সমশের গাজী নামা'' কাব্যে। সমশের রাজ বিদ্রোহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যখন সারা ভারতে শাসক শক্তির ভারকেন্দ্র বদলে যেতে বসেছে, ত্রিপুরার নিকটতম প্রতিবেশী বঙ্গদেশে মীর জাফরী দাবা খেলা চলেছে, ত্রিপুরায়ও তখন এক অস্থিরতা, রাজ্য শাসনকে শান্ত থাকতে দেয়নি। প্রজাদের বিক্ষোভ তো ছিলই, তাতে ইন্ধন দিয়েছিল অযোগ্য শাসন, প্রজা সাধারণের প্রতি শাসক কুলের অবজ্ঞা অত্যাচার। সমশের গাজী প্রজাদের প্রতিভূ হয়েই যেন উঠে দাঁড়ালেন অদম্য সাহস, তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও সংগঠন ক্ষমতা নিয়ে। মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করে নিলেন তিনি। সমশেরের সততার প্রমাণ নিজে সিংহাসনে না বসে ধর্ম মাণিক্যের পৌত্র বনমালীকে খুঁজে বার করে তাকে রাজার আসনে বসালেন লক্ষ্মণ মাণিক্য নামকরণ করে। শাসন ক্ষমতার হাল ধরে রইলেন সমশের নিজে। প্রজারা নাকি সমশেরের আমলে সুখেই ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ মাণিক্য বাংলার নবাব মীর কাশিমের সাহায্য নিয়ে সমশেরকে বন্দী করেন এবং তোপের মুখে বেঁধে তাকে উড়িয়ে দেন।

এই কাহিনী রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় এনে দিয়েছিল এক ভিন্ন স্বাদের বার্তা। এ নিয়ে কাব্য রচনারও এক বাস্তবনিষ্ঠ ইতিহাসের সাহসী উদ্‌ঘাটন।

সমশের গাজীর মৃত্যুর অনেক পরে, কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজ্যকাল শেষ হয়ে রাণী জাহ্নবী

দেবী রাজধর মাণিক্য, দুর্গামাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য পর পর রাজদণ্ড গ্রহণ করলে সমশের গাজী নামা রচিত হয়। রচয়িতার নাম মনোহর আলি বলে জানা যায়। তখন ঊনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক চলছে। যদিও সেই একই পয়ার ছন্দে, একই ভাষার আদলে রাজমালার ধারাবাহিকতাই লক্ষণীয় এ কাব্যে, তবু বিষয়বস্তুর স্বকীয়তায় এ কাব্যের মূল্য স্বতন্ত্র।

সমশের গাজীর উল্লেখ রাজমালা এবং কৃষ্ণমালা কাব্যেও আছে। কিন্তু সেখানে সমশের স্বভাবতই কালিমা লিপ্ত। রাজদ্রোহী, রাজাকে পরাজিত করার মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে রাজানুকূল্য পুষ্ট কাব্যে উচ্চ আসন যে দেওয়া হবে না, তাকে নিন্দিত চরিত্ররূপেই আঁকা হবে, এ তো জানা কথা। কৃষ্ণমালা কাব্যে বলা হয়েছে,

"সমশের গাজী এক আছিল তস্কর।
পরগণে দক্ষিণ শিক ছিল তার ঘর।।
দস্যুবৃত্তি করি ধন করিয়া সঞ্চয়।
হইবারে জমিদার তার মন লয়।।

এখানে সমশেরকে দস্যু তস্কর বলা হলেও সমশের গাজী নামা তার মেধা প্রতিভা ইত্যাদির উল্লেখ করে সমশেরের প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছে। গরীব কৃষকের ছেলে সমশের ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিল, এবং গভীর মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে, গাজীনামায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

"ছয় মাসে বাঙ্গালার শিখিল বৃত্তান্ত।
পাঠক সকলে কেহ নাই সমবন্ত।।
যাহারে বাড়াইবে প্রভু তার নাহি ঊন।
দিনে দিনে তাহার বাড়য়ে যশগুণ।।
লেখাপড়া গুণবন্ত পীরের নন্দন।
দেখি গুরু হইলেক আনন্দিত মন।।"

সমশেরের বাবার নাম ছিল পীর মহম্মদ। তাই পীরের নন্দন বলা হয়েছে তাকে।

সমশের গাজী নামা কাব্যে যে বাস্তব ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছিল, তা এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বাংলার কবিরা এ সময়ে এবং এর কিছু পরবর্তী কাল ধরে কাব্য সাহিত্যে অনেক মুন্সিয়ানা, পাণ্ডিত্য ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই পৌরাণিক কাহিনী ও প্রাচীন ইতিহাসের নিরাপদ আশ্রয় থেকে তুর্য নিনাদ করেছেন, সমকালের ঘটনাপঞ্জী নিয়ে নাড়াচাড়া করেন নি। পলাশীর যুদ্ধের একশ ঊনিশ বছর পর ১৮৭৬ সালে নবীন সেন এ বিষয় নিয়ে লিখলেন। এটাই সে যুগের একমাত্র কাছাকাছি সময় ধরে রাখা কাব্য। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, বীরবাহু কাব্য, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, নবীন সেনের প্রভাস, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এ সবই অতীতের দুর্গে আত্মরক্ষা করে লেখা। ১৮৫৭ সালে সারা দেশ কাঁপিয়ে ঘটে গেল অতবড় এক আলোড়ন, ছড়িয়ে পড়ল ছোটো বড় ধনীনির্ধন সব ভারতীয়ই কমবেশী, আত্মত্যাগের

অসংখ্য দৃষ্টান্ত জ্বলজ্বল করে উঠল ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু কারো নজর কাড়লো না সে সব। রস-অলংকারে সমৃদ্ধ হয়ে যে সব কাব্য সেদিন আমাদের সাহিত্যের রত্নাগার ভরে তুলেছিল, সারা দেশে খ্যাতিলাভ করেছিল, বাস্তবতার বিচারে, সমকালের নির্ভীক প্রতিবিম্বনের নিরিখে সমশের গাজীনামা কি তাদের থেকে অনেকটাই আগে দাঁড়াতে পারে না? হতে পারে পাণ্ডিত্যহীন ব্রাত্য ভাষায় লেখা, হতে পারে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টিতে অপারগ, তবু সত্যনিষ্ঠা ও সাহসের সম্পদ সমশের গাজী নামাকে সেকালের পটভূমিতে এমন এক আধুনিকতা দিয়েছে যা আজও অনতিক্রমনীয়।

গাজী নামার উত্তরসূরী আর কোনও কাব্য ছিল কিনা জানিনা। অর্থাৎ সমকালের সমস্যা, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে এর পর আর কোনও কাব্য এখানে বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। সমশের গাজী নামাতেই যেন শেষ হয়ে গেল সেই এগিয়ে আসার উদ্যম।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় নতুন ধরণেব সৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত হলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ঊনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৬২-৯৬)।

বাংলা কবিতা আবার চলে এল রাজপ্রাসাদে যেখানে দুঃখ মানে ''প্রাণ ধারণের, দিনযাপনের গ্লানি'' নয়, বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানেব অভাব নয়, যেখানে দুঃখ শুধু আবেগ অনুভূতির উদ্যানে ফুলের গন্ধ দখিনা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, যেখানে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি হয় ''আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ে''।

ভাষা ও কাব্য রসের নবযুগ উদ্বোধনে বীরচন্দ্রের অবদান ব্রজবুলির ব্যবহার, নির্দিষ্ট ছন্দের প্রয়োগ, কবির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেব দ্বার উন্মোচন। এর আগেও রাজা মহারাজারা অন্য কবিদের দিয়ে রাজকীয় মাহাত্ম্য সূচক কাব্য রচনা করিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা থেকে বীরচন্দ্র সরে এলেন। তিনি নিজে কবি, নিজে স্রষ্টা। বঙ্গদেশের কবিতার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওপর পড়েছিল। ব্রজবুলি এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ধরনে গীতি কবিতা রচনা তারই স্বীকৃতি দেয়। তবু তার মধ্যে কবির মৌলিকতা, নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে লাগল, যা এতদিন অনুপস্থিত ছিল ত্রিপুরার বাংলা কবিতায়। বীরচন্দ্র রচিত কাব্যগুলির মধ্যে হোরি, ঝুলন, উচ্ছ্বাস, অকাল কুসুম, প্রেমমরীচিকা এবং সোহাগ-এর উল্লেখ আমরা পাই। গ্রন্থগুলি দুর্লভ। বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দেখা হয় ১৮৯৪ সালে। তার আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ''ভগ্নহৃদয়'' কাব্য পাঠ করে বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁর রাজদূত রাধারমণ ঘোষকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে পাঠিয়ে। বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে মহাকাব্যের যুগসীমা অতিক্রম করে গীতি কবিতার নতুন অধ্যায় সূচিত করতে যাচ্ছেন, তাকে বীরচন্দ্র অভিনন্দিত করেছিলেন, ধরতে পেরেছিলেন আগত কালের স্পন্দন। কিন্তু বীরচন্দ্রের নিজের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা পড়েছিল, সে প্রশ্ন মাঝে মাঝে ওঠে। এ নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার, বীরচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ।

বীরচন্দ্রের কবিতা বচনার প্রতিটি নির্দিষ্ট তারিখ জানা না থাকলেও তাঁর রাজ্যকাল ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যে তিনি লিখেছিলেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। ঝুলন কাব্যটির রচনাকাল ১৮৯৩ খৃঃ বলে জানা যায়, যে জন্য এবছরটি ঝুলন কাব্যের শতবর্ষ পূর্তিরূপে পালনের কথাও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তার মধ্যে পড়ার প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া বীরচন্দ্রের কবিতাগুলি বৈষ্ণব রসাশ্রিত বেশীর ভাগ। রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী ছাড়া বৈষ্ণব ভাব নিয়ে কবিতা খুব কমই।

আবার এমন মতামতও শোনা যায়, ভানু সিংহের পদাবলীতে বীরচন্দ্রের ঝুলন কাব্যের প্রভাব হয়ত আছে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু মনে রাখা দরকার, ভানু সিংহের পদাবলী প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। বীরচন্দ্রেব 'ঝুলন' প্রকাশের প্রায় নয় বৎসর আগে। ভানু সিংহের পদাবলীর কবিতাগুলি ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৯১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই ভানু সিংহের পদাবলীতে বীরচন্দ্রের ঝুলন কাব্যের প্রভাব পড়ার কথা ওঠে না। দুই কবির কবিতায় যে ভাব-সাদৃশ্য বা ধ্বনি সমন্বয় পাওয়া যায়, তা হল আকস্মিক মিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও ব্রজবুলি সাহিত্যের যে যে উৎস থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন ভানুসিংহের পদাবলীর প্রেরণা, সেই আকর থেকেই বীরচন্দ্রও সংগ্রহ করেছিলেন ঝুলন কাব্যের ভাষা ও বিষয়। দুই কবির কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখানে সাজিয়ে দিলাম।

''আজ মন্দ মন্দ বহত পবন, বিরহিনীজন হৃদয় দহন,
পিয়াকি কারণ ঝুরত নয়ন, মাহেরী ফাগুন আয়েরী।
ফুটারহি ফুল মাধবী মালতী, গেন্ধী গোলাপ উজার সেউতি
ওউর বকুল চম্পক যুথি অলিয়াগন গুঞ্জরে
মত্ত ময়ুর নাচত যখন, হেরত বরজ যুবতী গণ
কোয়েলা কোয়েলী মধুকরগণ, দাস বীরচন্দ্র গায়েরী''।

[ঝুলন ঃ মহারাজ বীরচন্দ্র]

''মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যুথি জাতিরে।

[৮নং কবিতা ঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী]
- রবীন্দ্রনাথ

আরও কিছু কবিতায় এ ধরণের সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া যাবে। এগুলি সবই বৈষ্ণব গীতি কবিতার ফসল আর কবিজনোচিত আনন্দ বেদনার একই টানা পোড়েন। রবীন্দ্রনাথ ও বীরচন্দ্র কেউই পরস্পরকে প্রভাবিত করার মত পরিবেশ পান নি।

বীরচন্দ্রের মধ্যে যে নতুন লক্ষণ দেখা গেল, তা এই গীতি কবিতার অনুরণন। বাংলা

সাহিত্যে রাজকীয় সম্ভার নিয়ে মহাকাব্যের যে রেশ তখনও রয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গদ্য সাহিত্যে সে আকর্ষণ অতিক্রম করতে পারেন নি। বৌ ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে (১৮৮১ থেকে ৮৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে) বঙ্গদেশ ও ত্রিপুরার রাজকাহিনীই উপজীব্য। এই রকম সাহিত্য-মানসিকতার পটভূমিতে দাঁড়িয়েও বীরচন্দ্র নিজে রাজা হয়েও রাজ মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনায় না গিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হলেন, এটা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার লক্ষণ। বীরচন্দ্রের কবিতা গ্রন্থগুলি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু কবিতার ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনে সেগুলির পুনরুদ্ধার খুবই জরুরী।

বীরচন্দ্রের পর ত্রিপুরার কবিতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বীরচন্দ্রের কন্যা অনঙ্গ মোহিনী দেবী। অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কাব্য গ্রন্থই আমরা পাই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। প্রথম কাব্য কণিকা ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০১ খৃঃ) দ্বিতীয় কাব্য শোক গাথা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে, তৃতীয় গ্রন্থ প্রীতি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার মানসিকতা বীরচন্দ্রের চেয়েও আধুনিকতায় অগ্রসর স্বাভাবিকভাবেই।

পারিবেশিক প্রতিক্রিয়ায় আপন স্বতন্ত্র অনুভূতির কাব্যময় প্রকল্প, প্রকৃতিকে নিজের চোখ দিয়ে দেখা, এ সবই তাঁর লেখায় প্রধান স্থান নিয়েছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রথমা কন্যা ছিলেন অনঙ্গ মোহিনী। বিয়ে হয় উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্মণের সঙ্গে। অনঙ্গ মোহিনীর পরিচারণ ক্ষেত্র বিশেষভাবেই অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য পারিবারিক সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত চর্চার আবহ তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, কাব্য মানসিকতাকে গভীরতর করে তুলতে সাহায্য করেছে।

তাঁর কবিতার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন অবশ্য পিতা বীরচন্দ্র। পারিবাবিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাঁর কবিতায় কিছুটা দেখা গেলেও সে সব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব কবিমানস আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর অনেক কবিতায়, দেখা দিয়েছে তাঁব স্বকীয় দৃষ্টিতে দেখা পৃথিবী।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানীর মত ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা কবিরা আপন প্রতিভায় ভাস্বর। অন্তঃপুরের দ্বার তাঁরা খুলে দিয়েছেন। দেশ বিদেশের জ্ঞান ও সাহিত্যেব প্রশস্ত চত্বরে তাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, কামিনী রায় শিক্ষাব্রতীরূপে সমাজের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন, সরলা দেবী চৌধুরানী স্ত্রীমহামণ্ডল গড়ে তুলেছেন, পাঞ্জাবের হিন্দুস্থান পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন, সরোজিনী নাইডু ইয়োরোপ ঘুরে এসেছেন, ইংরেজীতে কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন, তরু দত্ত এর আগেই ইয়োরোপ গিয়ে এসে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করে চমকে দিয়েছেন সকলকে। বিচিত্র ও বিস্তৃত তাঁদের কর্মক্ষেত্র তখন জনজীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। তাঁদের কবিতার আবেদনও তখন তীব্র, দূরপ্রসারী। ভবিষ্যতের বস্তুবাদী ভাবধারার ভিত্তিরচনা চলেছে তাঁদের কবিতায়। অনঙ্গমোহিনী দেবী সে তুলনায় অনেক মৃদু স্বরে কবিতা লিখেছেন ভারতের এক প্রান্ত রাজ্যের সবুজ ছায়া ঘেরা, উৎক্ষেপ-বিক্ষেপহীন নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশে।

তাঁর কণিকা কাব্যগ্রন্থের বারোটি কবিতার মধ্যে ঊষা, মধ্যাহ্ন, নিশীথ সঙ্গীত, বর্ষা, বসন্ত ঊষায় প্রভৃতি কবিতা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা। এর পরের গ্রন্থ শোক গাথা কবির প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিতে রচিত। সেদিক দিয়ে এগুলি আত্মগত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। প্রীতি কাব্যটি কবির পরিণত মনের রচনা। সেজন্য কবিতাগুলি ভাব ও ভাষা দুদিকেই গভীর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ পরিবারের যোগাযোগ ইতিমধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পারিবারিক পরিচিতি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাপক প্রভাব তখন ছড়িয়ে পড়েছে, তা স্পর্শ করেছিল অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কবিতাকেও।

''ক্ষিপ্ত পিয়াস জীবনে যাহার
বধে সে বিরহে আপনায়,
অধীর বিলাপ বাসনা দীপনে
জেগে ওঠে ঘোর যাতনায়।''
[প্রীতি কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা ''সাধনা'']

''নদীর পারে বনের ধারে
উড়িয়া যায় জোনাকি
ঝরিছে পাতা বিষাদে লতা
কাঁপিয়া ওঠে চমকি''।
[শোক গাথা ঃ নিশীথে ঝটিকা]

রাজকুমারী তাঁর প্রাসাদের জানালা থেকে বাইরের জগৎকে যেটুকু দেখেছেন, কুঁড়ে ঘর, বাঁশের মাচায় ঝিঙে ফুল, কলসী কাঁখে গ্রাম্য বধূ এসব ছবি তাঁর কণিকায় মাঝে মাঝে দেখা গেছে। কবির বিচরণ ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হলে, তাঁর কাছ থেকে আরও বিচিত্র সৃষ্টি ত্রিপুরা পেতে পারত।

সে সময় রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও কিছু কবিতা লিখেছেন, মহারাজ রাধাকিশোর, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর, মহারাণী তুলসীবতী, মহারানী প্রভাবতী, রাজকুমারী কমলপ্রভা, এরা সকলেই কিছু কিছু কবিতা ও গান রচনা করেছেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সেগুলির সঙ্গে পাঠকদের তত পরিচিতি ঘটে নি। এটুকু জানা যায়, সেগুলি প্রায় সবই বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলীর ধরনে লেখা। এই সব পদাবলীসিক্ত কবিতার ভাবরাজ্য থেকে ত্রিপুরার বাংলা কবিতার উত্তরণ ঘটিয়েছিল রবীন্দ্র প্রভাব। রবীন্দ্র প্রভাবই ত্রিপুরার কবিতাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল যার পুরোধা ছিলেন অনঙ্গ মোহিনী দেবী।

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশক থেকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে আরও সামনে এগিয়ে যাবার যে প্রয়াস দেখা গেছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দের মধ্যে, ত্রিপুরায় তার ঢেউ খানিকটা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সৃষ্টি করেছে বিশেষ করে পাঠক মনের রসগ্রাহিতার এলাকায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তেমন কোনো কবি ব্যাপক পরিচিতি নিয়ে

এসে দাঁড়াননি এখানে। তবে চল্লিশের দশকে কয়েকজন কবিকে আমরা দেখি সৃষ্টির বেশ, কিছু ক্ষমতা নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন। এঁদের মধ্যে মনে পড়ছে বিধু ভূষণ ভট্টাচার্য, মোহম্মদ আব্দুল মতিন, সমাচার চক্রবর্তী, অজিত বন্ধু দেববর্মণ প্রমুখের নাম। এঁদেরও কারো কবিতার বই বার হয়নি। সেই সময়কার পত্র পত্রিকায় তাঁদের কবিতা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সে সব কাগজও এখন তেমন পাওয়া যায় না। অথচ ত্রিপুরার বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার তালিকায় এঁদের একটা বিশেষ স্থান অবশ্যই আছে। বিধু ভূষণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতার কয়েক লাইন এখানে তুলে ধরছি —যার মধ্যে বাস্তব আধুনিকতার স্পষ্ট দ্যোতনা দেখা গেছে।

''এ পারেতে সোজাসুজি
মার প্যাঁচ বোঝাবুঝি
খেটে খাওয়া ভিখ চাওয়া
কভু অনশন
তাতে নয় অরাজী তেমন।
এ পারেতে সুখী এ জীবন।
জীবন যেথায়
ছোঁয়া ছোঁয়া আছোঁয়ার বোবা ইশারায়
সেতুটুকু পার হয়ে যেতে নাহি চায়।''

মোহম্মদ আব্দুল মতিনের কবিতায়ও শোনা গেছে নতুন দিনের জন্ম ঘোষণা ঃ

''আদিগন্ত তমিস্রার তিক্ত রাত্রি নিতেছে বিদায়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্তি ঘেরা প্রত্যাসন্ন দিবসের ছবি
রাত্রিব আত্মার মাঝে তিলে তিলে জন্ম লাভ
দৃঢ়তার সাবলীল প্রতি দণ্ড তার''

এইসব কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষণীয় প্রয়াস দেখা গেছে। সে সময়ে ত্রিপুরার কবিতার যে অস্পষ্ট অধ্যায় চলছিল, তার মধ্যে একটা ধ্বনিতরঙ্গ অন্ততঃ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই কবি গোষ্ঠী, যাঁদের কবিতা আমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত এঁরা লিখেছেন, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি এঁরা দেখেছেন, উদ্বাস্তু স্রোতে ত্রিপুরার সমাজ জীবনের অনেক পট পরিবর্তন এঁদের চোখের সামনে ঘটেছে। কিন্তু এই কবিরা খুব যে আলোড়িত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত রেখে যান নি।-

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরার ভারত ভূক্তি আচমকা তেমন কোনও ওলোট পালোট না ঘটালেও একটা বড় ঘটনার সূচনা করেছিল নিঃসন্দেহে। সেটা হল পূর্ব বাংলার বাস্তুহাবা জনস্রোতে ত্রিপুরার শহর গ্রাম ভরে ওঠা।

মূল অধিবাসীর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল উদ্বাস্তুদের সংখ্যা। এই উদ্বাস্তুরা তাদের সব খোয়ানো হাহাকারের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এক প্রবল অস্তিত্বের সম্পদ, বাংলা সাহিত্য

সংস্কৃতির বিস্তার। এরই ফলে পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকের মধ্যে ত্রিপুরার কবিতার দুর্বল ধমনীতে কিছু নতুন রক্তের সঞ্চার ঘটল। আগরতলায় সাহিত্য বাসর নামে এক সংস্থা গড়ে উঠল। এখানে শক্তি হালদার, অশ্বিনী আঢ্য, অনিল ভট্টাচার্য, খগেশ দেববর্মণ, সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ, রমাপ্রসাদ দত্ত, বিধু ভূষণ ভট্টাচার্য, সমাচার চক্রবর্তী, মোহম্মদ আব্দুল মতিন, চিদানন্দ গোস্বামী প্রমুখ কবিরা নিয়মিত অংশ নিতেন, স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন, পশ্চিমবঙ্গের কবিতা নিয়ে আলোচনা বিতর্ক হত প্রাণবন্ত ব্যাপকতায়। গ্রন্থ প্রকাশের অভাব কিছুটা মেটাতে চাইত এই সাহিত্য-সভা। কবিতার আলোচনায় টেনে আনত পশ্চিমবঙ্গকে। ভূগোলের নতুন সন্নিবেশে ত্রিপুরা তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরতিক্রম্য দূরত্বে সরে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সীমা দিয়ে বেষ্টিত ত্রিপুরা হয়ে উঠেছে একটা দ্বীপের মত। আকাশ পথ ছাড়া যাতায়াত কষ্টকর। অথচ ভাষার নিগড়ে ত্রিপুরা এমনভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, একটা স্বাধীন সাহিত্য মণ্ডল গড়ে তোলাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অসমীয়া সাহিত্য বা মণিপুরী সাহিত্যের মত স্বতন্ত্র মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের। আবার দেশের প্রধান ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, নানা অসুবিধাব শিকার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সমপর্যায়ে ওঠাও ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যেব পক্ষে হল দুরূহ।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় গড়ে উঠল রবীন্দ্র পরিষদ, যার হাল ধবলেন ত্রিপুরার বাইরে থেকে এসে বাংলার অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুবী। রবীন্দ্র পবিষদ শুধু রবীন্দ্র সাহিত্য নয়, সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের এবং ত্রিপুবাব অন্যান্য ভাষা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিব সহায়তায় যথাসাধ্য প্রয়াসী হল। এর পর ত্রিপুরার কবিতায আধুনিকতার হাওয়া বেশ জোবে লাগিয়ে দিল ১৯৬২ সালের প্রান্তিক কবিতা সংকলন। প্রাসাদ সাহিত্য এবং রবীন্দ্রগন্ধী কবিতার অধ্যায়ের পর এই প্রথম ত্রিপুবাব কবিদের কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হল, যদিও কোনো একক কবিব নয়, তবু কবিদেব খুঁজে পাওযা ও চিহ্নিত কবার একটা আয়োজন হল; যা এখানকার কবিতার ইতিহাসে বেশ বড় ঘটনা। সম্পাদনায ছিলেন সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ ও খগেশ দেববর্মণ। বনেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, অপরাজিতা রায়, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, করবী দেববর্মণ, প্রবীর দাস, অশোককান্তি দাশগুপ্ত, সত্যব্রত চক্রবর্তী, কিরণ শংকর রায়, খগেশ দেববর্মণ, প্রদীপ চৌধুবী এই এগারোজন কবির কবিতা নিয়ে বার হল ''প্রান্তিক''।

পশ্চিমবঙ্গে তখন বস্তুনিষ্ঠ সমাজ সচেতন কবিতার ধারা নিয়ে উপস্থিত বিষ্ণু দে, দীনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিবৃন্দ। জীবনানন্দের নিসর্গ নন্দিত আত্মমগ্ন বোধের সীমানা এই কবিরা তখন ছাড়িয়ে গেছেন। ত্রিপুরার প্রান্তিকে সমকালীন বাস্তবের রুক্ষ কঠিন বিপর্যস্ত অবয়বের রেখা যেমন ধরা পড়ল, তেমনি আশেপাশের নদী মাঠে, উদ্যানের অন্ধকারে, বর্ষার উর্বরতায় জীবনানন্দও জড়িয়ে রইলেন। নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ কবিতার মধ্যে সঞ্চার কবল এক অভূতপূর্ব বেগ। ''টেরেকোট্টায় মোজায়েক করা মেঝের মত শব্দের শরীব'' [বিজনকৃষ্ণ] ''নগরে নক্ষত্র পল্লী একবার জ্বলে ওঠে সবার সম্মুখে'' [সলিলকৃষ্ণ] ''সারাদিন কেঁপে কেঁপে মসজিদের

রূপোলী মিনার বিকেলে হ্রদের জলে লঘু রঙে আবছা হয়ে যাবে'' [সত্যব্রত চক্রবর্তী] এসবের মধ্যে যন্ত্রণাবিদ্ধ যে অস্তিত্ব নিজেকে জাহির করতে চায়, তা অগ্রসর আধুনিক মননের প্রতিফলন। অবশ্য একথাও মেনে নিতে হয় যে, এসব পংক্তি মেনে পশ্চিমবঙ্গের কবিতার ছায়া ছড়িয়ে ত্রিপুরার লুঙ্গা টিলা পাহাড় ছড়ায় ঘেরা জনগোষ্ঠীর সুখ দুঃখের কোনও স্বতন্ত্র লক্ষণ তুলে ধরেনি। তবু অন্ততঃ নিজস্ব চিহ্নের দিকে এগিয়ে যাবার একটা প্রাণশক্তি এসব কবিতায় সাড়া তুলেছে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ''টেরেকোট্টায় মোজায়েক'' ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলছেন, ''সিংলুমে গিয়ে হ্লাংখলকে গিয়ে বলি, বুকে হাত/রাখো আমার, কান পাতো, শুনতে কি পাও ধলাই মনুর/নতুন বৃষ্টি ধোয়া গৈরিক দবদবানি''।

যাঁদের কবিতা নিয়ে প্রান্তিক সংকলিত হয়েছিল, তাদের সকলেই অবিচ্ছিন্নভাবে ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় নিমগ্ন থাকেন নি। বিজনকৃষ্ণ এবং সলিলকৃষ্ণের আমৃত্যু আত্মীয়তা ছিল কবিতার সঙ্গে। সত্যব্রত চক্রবর্তী কবিতার এলাকায় পরে কল্যাণব্রত চক্রবর্তী নামে পরিচিত হয়েছেন। ১৯৭৬ সালে তাঁর একমাত্র কবিতার বই ''অন্ধকারে প্রণামের ইচ্ছা হয়'' প্রকাশ হয়েছে। ত্রিপুরার বাংলা কবিতার হাল আজও তাঁর হাতেই ধরা আছে একথা বললে বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হবে না। শ্রীমতী করবী দেববর্মণ কবিতা লিখে চলেছেন আজও, ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছেন আন্তরিকতায়। এ পর্যন্ত তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তার। ''লুন্ঠিত সময় সীতা'' ''কবিতা আমার সময় অসময়'', ''মেরুদণ্ড দাও''। সলিলকৃষ্ণের কবিতা গ্রন্থ ''জলের ভেতর, বুকের ভেতর'' এবং বিজনকৃষ্ণের বই ''জলপ্রপাতের কাছে নতজানু'' আমরা পেয়েছি কিছু সময়ের ব্যবধানে। কবিতার রাজ্যে এভাবেই ত্রিপুরা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে ছাপা হচ্ছে বই, কবিতা পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে, এখানকার কবিতা বহির্রাজ্যে আকর্ষণীয় ও আমন্ত্রিত হচ্ছে।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতাকে যাঁরা হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাদের মধ্যে মনে পড়ছে এই নামগুলি — পীযূষ রাউত, স্বপন সেনগুপ্ত, মিহির দেব, শংখ পল্লব আদিত্য, সমরজিৎ সিংহ, অসীম দত্ত রায়, রাতুল দেববর্মণ, নকুল রায়, দিলীপ দাস, কিশোর রঞ্জন দে, সনজিৎ বণিক, পাঞ্চালী দেববর্মণ, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, সেলিম মুস্তাফা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, হিমাদ্রী দেব, অজিতা চৌধুরী ও আরো কয়েকজন। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন কয়েক বৎসর হল কর্মজীবনের সূত্রে। এখানে আসার আগে পশ্চিমবঙ্গেই তাঁর কবি প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছে। তাকে পুরোপুরি ত্রিপুরার কবি বলা চলে না। এখানে মনে পড়ে যায় রনেন্দ্রনাথ দেব ও কার্তিক লাহিড়ীর প্রসঙ্গও। জীবিকার সীমা সমাপ্ত হতেই যাঁরা ত্রিপুরাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

এখন যাঁরা এখানে লিখছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই এক বা একাধিক কবিতার বই বার হয়ে গেছে, যেগুলোর মধ্যে জ্বলে উঠেছে মাঝে-মাঝে অনবদ্য সব পংক্তি, ছুরির ফলার মত, সামনে জমে ওঠা সময়ের নিকষ কঠিন যন্ত্রণাকে ফালা ফালা করে দেবার স্পর্দ্ধা যেখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

আকাশে শকুনের মত ভাসে রোদ
অথবা রোদের মতই শকুন
আগুনের ফুলকি ছড়ায়
ঘর পোড়ে, মাঠ পোড়ে
পোড়ে আমিনা বিধির কপাল
খরার তীক্ষ্ন নোখ ফালা ফালা
করে কেটে যায় চতুর্দিক
কলিমুদ্দিন, এইভাবে আর কতোদিন
এই সনে ভাঙ্গা নৌকা মেরামত করো হাল ধরো
তারপর ভাসায়ে চলো
এই নদী পার হয়ে যাই''

[ভাঙ্গা নৌকার গান ঃ অসীম দত্তরায়]

''বুকে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের নেশা
আমিই সৈনিক ও হাতিয়ার
কেনোনা মাথা তুলে দাঁড়াবার এছাড়া বিকল্প নেই।''

[প্রতিস্বর ঃ কৃত্তিবাস চক্রবর্ত্তী]

''রাত প্রহরী লাঠি ঠুকে ঠুকে অবসন্ন হলে
সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমার ঘরে ফেরার কথা আছে
আগামী কালের কবিতা তখুনি লেখা হবে।''

[যবনিকা কম্পমান ঃ অরুন্ধতী রায়]

কবিদের নিজস্ব গ্রন্থ ছাড়াও কিছু কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কয়েকজন কবির কবিতা নিয়ে। ত্রিপুরার বাংলা কবিতার এলাকা বাড়িয়ে তুলেছে সেগুলি। প্রান্তিকের পর ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে ''এক আকাশ তারা'' প্রবীর দাস ও শ্রীবাস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। এরপর ১৯৭৩ সালে ''দ্বাদশ অশ্বারোহী'' স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায়। ১৯৮৫-তে প্রকাশিত হয় তিনটি সংকলন। কল্লোল দত্তের সম্পাদনায় উড়ে যায় স্বর্ণ মেঘ, বিজনকৃষ্ণ ও কল্যাণব্রতর যুগ্ম সম্পাদনায় বক্ষস্থলে নিবিড় জোনাকি এবং নিলিপ পোদ্দার সম্পাদিত জেগে থাকি অনন্তকাল। এরপর ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার সিংহের সম্পাদনায় ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্ব-নির্বাচিত কবিতা সংকলন, ১৯৯৩ সালে রূপক দেবনাথের সম্পাদনায় ত্রিপুরার বাংলা কবিতা।

তরুণতর আরও একদল কবি প্রচুর সম্ভাবনা, জেদ এবং প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে উঠে আসছেন যাঁদের সামনের সারিতে দেখতে পাচ্ছি প্রবুদ্ধসুন্দর কর, স্বাতী ইন্দু, পল্লব ভট্টাচার্য, মিত্রারুণ হালদার, অশোক দেব, সুবিনয় দাশ প্রমুখকে। তাঁদের পক্ষে বলার মত একটা কাগজ ''বাংলা কবিতা'' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে যাওয়া। যার মাধ্যমে ''তরুণ কবিদের উদ্ধত মুদ্রার নির্বিকল্প রূপ'' তাঁরা তুলে ধরতে চাইছেন। এঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অন্ততঃ একথা জানিয়ে দিচ্ছে, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্পর্দ্ধাই মানুষ কবিকে সৃষ্টিশীল রাখে, স্থবির হতে দেয় না।

ত্রিপুরার গল্পকার ঃ চার থেকে আটের দশক

সিরাজুদ্দীন আমেদ

রবীন্দ্র-সমকালীন যুগে ত্রিপুরায় কাব্য-কবিতা রচনা শুরু হলেও ছোট গল্প লেখা শুরু হয়েছে তার অনেক পরে। রাজাদের আমলে আগরতলা থেকে যে দুই-একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত, সেখানে মাঝে মধ্যে দুই-একটি গল্পও থাকত। তখনকার দিনে আগরতলায় প্রকাশন ব্যবস্থা শুধু যে অনুন্নত ছিল তাই নয়, বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতারও যথেষ্ট অভাব ছিল। সেজন্য নিয়মিত সাময়িক পত্র-পত্রিকা বের করে তার মাধ্যমে গল্প লেখা-লেখির চর্চার তখন সুযোগ ছিল খুবই কম। তবু নানারকম বাধা সত্ত্বেও তিনের দশক থেকে আগরতলায় গল্প শুরু হয়েছিল। তবে চারের দশক থেকেই এখানকার গল্প-রচয়িতারা মোটামুটি একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে থাকেন।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬) এবং প্রগতি (১৯২৭),— এই তিনটি সাময়িক পত্র বাস্তবতা ধর্মী গল্প রচনার পরিবেশ গড়ে তোলে। মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের নানারকম জটিল ছবিই ছিল সেইসব গল্পের কেন্দ্রিক বিষয়। ত্রিপুরার প্রথম দিকের গল্পে কলকাতার নগর জীবনের জটিলতা তেমন বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবু আধুনিক শহুরে জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই সেখানে লক্ষ্য করা গেছে। আবার এরই পাশাপাশি ত্রিপুরার গ্রামীণ ও উপজাতি-জীবনের নানান সমস্যা নিয়ে কয়েকজন গল্পকার চিন্তা ভাবনা করেছেন।

ত্রিপুরার গল্পকারদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এই সীমাবদ্ধতা পাঁচের দশক পর্যন্ত বেশ সুস্পষ্ট। এর কারণ অনেক। প্রথমত, ত্রিপুরা ছিল একটি রাজন্য শাসিত অঞ্চল। এটি ব্রিটিশের করদ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও এখানকার রাজারা রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব এখানে পড়ে নি। এমন কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, গ্লানি ও হতাশার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকেও স্বাধীন ত্রিপুরা ছিল মুক্ত। বিশেষত এর পার্বত্য এলাকায় বহিঃত্রিপুরার কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। দুর্গম পার্বত্য এলাকার উপজাতি-জীবনের ধারা বয়ে চলেছিল একটি স্বতন্ত্র খাতে। সেখানকার জুমচাষ-নির্ভর আদিম কৌম জীবনের সঙ্গে সমতল অঞ্চলের তো বটেই, এমনকি শহর আগরতলারও কোনো যোগ ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আজও চোখে পড়ার মতো। ফলে ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ড থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন এক জীবন ধারার মধ্যে বাস করে ত্রিপুরার লেখকরা

ভারতীয় সমাজবিবর্তনের অভিজ্ঞতা -অর্জনের সুযোগ থেকে যথেষ্ট বঞ্চিত ছিলেন। তাই তাদের রচনায় সমকালীন জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি তেমন উল্লেখযোগ্য-ভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। তবু এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ত্রিপুরার গল্পকাররা ধীরে ধীরে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনের দশকে ত্রিপুরার যে সমস্ত গল্পকার লেখালেখি শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অজিতবন্ধু দেববর্মা এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। মূলত সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই এঁদের আত্মপ্রকাশ। অজিতবন্ধু দেববর্মার 'পরিচয়' (১৯৩৩) এবং রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্যামসন বক্স' (১৯৩৪) নামক গল্প দুটি ১৯৮৫ সালে সুখময় ঘোষ এবং বিকচ কুমার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরার পাঁচ দশকের গল্প' নামে একটি সংকলনে স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলি গল্প হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও তিনের দশকে ত্রিপুরার গল্পকাররা কী ধরণের গল্প লিখতেন তার একটা পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। অজিতবন্ধু দেববর্মার 'পরিচয়' গল্পের নায়ক অমিয়াংশু গল্পের বক্তা। বন্ধু বান্ধবের আড্ডায় সে গল্প বলে আসর জমিয়ে রাখে। একদিন সে তার বিবাহিত জীবনের গল্প বলছিল। সেই গল্পে তাদের দাম্পত্য জীবনের একটি মধুর ছবি ছিল। অমিয়াংশুর গল্প শুনতে শুনতে আসরের বন্ধুবান্ধবরা তাদের এই দাদাটির প্রতি একান্ত অনুরাগিনী বৌদির একটি কাল্পনিক চিত্র এঁকে ফেলে। একদিন তারা সকলে মিলে বৌদির সঙ্গে আলাপ করাব জন্যে অমিয়াংশুর বাড়ি যেতে চাইল। অমিয়াংশু তাদের একদিন বাড়ীতে আসার নিমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু নিমন্ত্রণে যাবার দিন সকালে সে একটা চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা আছে যে, সে বিয়ে করেনি। তার মতো কুৎসিৎ চেহারার মানুষকে কে বিয়ে করবে? এতদিন সে তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে শুধু স্বপ্নের জাল বুনে তৃপ্ত করেছে। পরিশেষে সে বিদায় জানিয়ে লিখেছে — "সত্য ঘটনার মতো ক'রে তোমাদের শুনিয়ে আনন্দ পেতাম, তোমরাও পেতে। সেদিনও যখন ফুরল — বিদায়" গল্পের করুণ সমাপ্তি নাটকীয়তার সৃষ্টি করলেও সামগ্রিকভাবে গল্পটি দানা বাঁধতে পারেনি, শুধুমাত্র কুশ্রীদর্শন অমিয়াংশুব প্রতি পাঠকের সমবেদনা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্যামসন বক্স' গল্পটি বেশ অভিনব। স্যামসন নামে এক খ্রীষ্টান ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে পড়ত। দীর্ঘ বারো বছর ধরে চেষ্টা করেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। সে কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তার হাড়গোড়ের বাক্সটি রেখে যায়। এই বাক্সটি অনেকের জীবনেই দুর্ভাগ্য এনে দিয়েছে। এটি যার কাছে থাকে সে তার পঠিত বিদ্যা ভুলে যায়। ফলে ছাত্রদের মধ্যে স্যামসনের বাক্সটি বিভীষিকার সৃষ্টি করল। কিন্তু বিজনবাবু নামে একজন ব্যক্তি স্যামসন বক্সের এই ঘটনাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বিজনবাবু তাঁর পড়াশোনা শেষ করে হাওড়ায় তাঁর দেশের বাড়ীতে মোটর যোগে যাওয়ার সময় তাঁর সতীর্থরা স্যামসন বক্সটি তাঁকে উপহার দিল। শেষমেশ দেখা গেল বিজনবাবু বাড়ী যেতে পারেন নি। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঙ্গা লেগে যাওয়ায় তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। গল্পটির মধ্যে একটু অলৌকিক ব্যঞ্জনা আছে। লেখক সম্ভবত

বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না এমন একটি গল্পই উপহার দিতে চেয়েছেন। তাই রাজেশ্বর মিত্রের এই গল্পটিও অজিত বন্ধু দেববর্মার গল্পের মতোই ত্রিপুরার গল্প লেখার ইতিহাসের আদিকথার একটি পরিচয় মাত্র তুলে ধরে।

প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার ছোট গল্প তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল অসহায় মানুষ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে বাধ্য হন। এঁদের একটা অংশ ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। ফলে জনসংখ্যার বিন্যাসের দিক থেকে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি এক অকল্পনীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। উপজাতি-প্রধান রাজ্যটির পূর্ব পরিচয় হারিয়ে যায়। প্রবল জনস্ফীতি এবং তজ্জনিত সমস্যায় জর্জরিত ত্রিপুরা আকস্মিকভাবে মূল্যবোধহীনতা ও এক অনিশ্চিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। স্বাভাবিকভাবে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ আর থাকে না। তবুও এই সময়ে হরিদাস চক্রবর্তী, বিমল চৌধুরী, সৈয়দ নুরুল হুদা প্রমুখ গল্পকারগণ বেশ কিছু সার্থক গল্পের জন্ম দিতে পেরেছেন।

হরিদাস চক্রবর্তীর 'অবিস্মরণীয়' (১৯৫১) গল্পটি উল্লেখের দাবী রাখে। বিবাহিতা ব্রাহ্মণ দেবকুমারের প্রতি শ্রেষ্ঠী সুরথের কন্যা সুতপার প্রেম এই গল্পের কেন্দ্রীয় বিযয। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর নিষ্পাপ গৃহিণী উমার প্রতি নিষ্ঠায় অবিচল। অথচ দেবতার আরাধনায় ধ্যানে বসলেই ব্রাহ্মণ দেবকুমারের চৈতন্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যায় বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির বদলে চিরবিরহিনী রাধার মূর্তি। সেই রাধাও আবার শ্রেষ্ঠী সুরথ-কন্যা সুতপারই মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত উমা ও সুতপার বিপরীতমুখী আকর্ষণে ব্রাহ্মণ দেবকুমার দিশাহীন হয়ে পড়েন। শেষে তিনি মন্দির ও গৃহ সব কিছু ছেড়ে অজানা পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই গল্পটি লেখকের সমকালীন জীবনের কোনো ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষীর সম্পর্কজনিত সমস্যার টানাপোড়েন এখানে পাঠককে একটি অবিস্মরণীয় উপলব্ধির দিকে ঠেলে দেয়।

গল্পকার বিমল চৌধুরী তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই একদিকে যেমন সামন্ত প্রথায় আবদ্ধ ত্রিপুরায় উপজাতি জীবনের সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করেন, তেমনি তাঁর গল্পে সমকালীন বাস্তবতামণ্ডিত জীবনচিত্রটিকেও তুলে ধরতে সক্ষম হন। চারের দশকের গল্প হিসেবে তাঁর 'জাগরণ'(১৯৪৭) ত্রিপুরার গল্পে একটি নতুন মাত্রা এনে দিতে পেরেছে। উপজাতি-সমাজে কেউ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা ধরে নেয় যে, এই ব্যাধি কোনো অপদেবতার সৃষ্টি। তখন ওঝা আসে। আরোগ্যের জন্য সেই দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর, হাঁস, মোরগ, মদ ইত্যাদি পূজার সামগ্রী নিবেদন করা হয়। এবং রোগীর হাতে এক গোছা সাদা সুতো বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু দেবতার সাধ্য নয় ব্যাধি থেকে মুক্তি ঘটানো। ফলে উপজাতির জীবনের নিদারুণ অজ্ঞতাই জয়ী হয়। বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই রকম একটি সমস্যার স্মারক হল 'জাগরণ' গল্পটি। এখানে কালিগাই নামক এক উপজাতি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পুত্র নগুরাই শত চেষ্টা করেও তার পিতাকে রাজধানী

আগরতলার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে নি। এর আগে সে তিন বছর আগরতলায় কাটিয়েছে। সে দেখেছে তাদের রাজা তাদেরই মতো এক আদিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত প্রসাদ ভোগ করছে। আর কালিগাই-এর মতো আদিবাসী মানুষ বিজ্ঞানের সুফল থেকে কত বঞ্চিত। কালিগাইদের কখনো চিকিৎসা হয় না, তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে সুনিশ্চিত মৃত্যু। গল্পের শেষে নগুরাই তার পিতার মৃতদেহ আগলে স্থাণুর মতো বসে থাকতে থাকতে ভাবে সামন্ত প্রথার সমস্ত রকম শোষণ-বঞ্চনা থেকে পার্বত্য উপজাতিদের মুক্তি পেতেই হবে। গল্পের সমাপ্তিতে নগুরাই-এর কণ্ঠে একটি দৃপ্ত শপথ উচ্চারিত হয়েছে। গল্পকার বিমল চৌধুরী এখানে শুধু বাস্তবতাকেই তুলে ধরেন নি। তিনি তাঁর সমকালীন জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই তাঁর গল্পে সমাজ বাস্তবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পাঁচের দশক থেকে ত্রিপুরার গল্পে নানা সমস্যায় জর্জরিত এখানকার জনজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান পেতে থাকে। এই সব গল্পে ত্রিপুরার শহর ও সমতল অঞ্চলের পরিবেশ যেমন আছে, তেমনি পার্বত্য ত্রিপুরার লুঙ্গা টিলা অধ্যুষিত জনজীবনের দ্বন্দ্বময় সন্ধিক্ষণের নানান চিত্রও আছে। মানুষের বিপন্ন অস্তিত্ব, জীবিকার জলন্ত সমস্যা, সমাজের মাটি থেকে ব্যক্তির উৎখাত হয়ে যাওয়ার সমস্যা, ফেলে আসা শৈশব-কৈশোরের নিদারুণ স্মৃতি, সব হারানোর যন্ত্রণা এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম এইসব গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

বিমল চৌধুরী তিন দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে গল্প লিখে চলেছেন। তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর চারপাশের মানুষকে দেখতে চেষ্টা করেন। সেই দেখার মধ্যে যে নিষ্ঠা ও গভীরতা থাকে, অত্যন্ত সততার সঙ্গে তাকে তিনি গল্পে ফুটিয়ে তোলেন। 'অনুভাব' তাঁর একটি অসাধারণ গল্প। এতে আছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার ছবি। এখানে গল্পের নায়ক মকবুল। পশ্চিমের কার্যস্থল থেকে দুবছর পর ট্রেনে চড়ে সে ঢাকায় ফিরছে। গেণ্ডারিয়া স্টেশনে ট্রেন থামতেই মকবুল নেমে পড়ল। এদিকে দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে 'মইন্যা' নামে একজন হিন্দু যুবক প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে বদ্ধপরিকর। সে শুনেছে স্টেশন থেকে নেমে একজন মুসলিম যুবক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। মকবুল বিপদের আশঙ্কা করে চিন্তিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে দেখে রাস্তার ধারে একটি শিশু হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশেই এক জলাশয়ে শালুক ফুল তুলতে গিয়ে জলে পড়ে গেছে। শিশুটির আর্ত চিৎকার শুনে মকবুল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। মৃত্যু অবধারিত জেনেও সে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে শিশুটিকে রক্ষা করে এবং শিশুটিকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। শিশুটি হিন্দুর সন্তান, — একথা জানা সত্ত্বেও নিজের প্রাণ বাজি রেখে শিশুটিকে সে রক্ষা করায় 'মইন্যা' নামে সেই হিন্দু যুবকটি অভিভূত হয়ে পড়ে। সে তার পোষাকের ভেতর থেকে একটি ধারালো ছোরা বের করে জলের মধ্যে ফেলে দেয় এবং মকবুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে। দাঙ্গা বিরোধী এই গল্পে লেখক মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম গল্প খুব কমই লেখা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের জীবনের ফেলে আসা স্মৃতি নিয়ে লেখা তাঁর আব একটি গল্প হল 'হিজল খালের কান্না'। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগরতলার শিশু উদ্যানে মেলা বসেছে। এই মেলায় একজন হিন্দুস্থানী হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে সুর করে একটি বাক্স সামনে রেখে হেঁকে চলেছে — লণ্ডন দেখ্‌খো/পারিশ দেখ্‌খো রংদার এই দুনিয়া দেখ্‌খো ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একটি উদ্বাস্তু শিশু সেই সুর শুনে এই যাদুকরী বাক্সওয়ালার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তখনো 'লোকটি হেঁকে চলেছে — দ্যেখ্‌লাও খোকা......যা চাও সবকুছ দেখতে পারবে.....। শিশুটি ব্যাকুল হয়ে বলে, সে শুধু তার ফেলে আসা গ্রাম নিশ্চিন্তপুর দেখতে চায়। কিন্তু বাক্সওয়ালা এই শিশুটিকে তার জন্মস্থান দেখাতে পাবে না। তখন শিশুটি ডুকরে কেঁদে ওঠে। গল্পটিতে ছিন্নমূল একটি উদ্বাস্তু শিশুর জন্মস্থান ফেলে আসার শুধুমাত্র বেদনাই নয়, শিশুটির নস্টালজিক অনুভূতি সহ-সব হাবানোর যন্ত্রণাও অসাধাবণ মূল্য পেয়েছে।

বিমল চৌধুরীর 'মানুষের চন্দ্রবিজয় এবং তারানাথ' শীর্ষক গল্প-সংকলনের শেষে ঐ নামেরই একটি গল্প স্থান পেয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে অনেক মানুষ চাঁদে পৌঁছালেও সেই খবর বেকার তারানাথকে আকৃষ্ট করতে পাবে না। তার স্বপ্ন ছিল সে অনুরাধাকে নিয়ে সংসার পাতবে। তাই চাঁদ নয়, এই মুহূর্তে অনুবাধাকেই তার বড়ো বেশি দরকার। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাবানাথ শেষ পর্যন্ত চাকরি পেল। তখন তার মনে হল, সে তাব স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। জয়েব আনন্দে তাব মন উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু তার এই আনন্দের মুহূর্তটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সে দেখতে পেল, তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে, তার চির পরিচিত অনুরাধার নবজন্ম হয়েছে। অনুবাধা নতুন এক প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তখন মানুষের চাঁদে পৌঁছানোব খবব তাব কাছে নিতান্তই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে তখন চাঁদ পাওয়া প্রমত্ত জনসমুদ্র ঠেলে নিঃস্ব ক্লান্ত পায়ে ফিরে যায়। লেখক এই গল্পে মানুষের হতাশা, গ্লানি ও পরাজয়ের বেদনাকে বড়ো করে দেখিয়েছেন।

বিমল চৌধুরী এইভাবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে বাংলা ছোট গল্পের জগতে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান কবে নিতে পেরেছেন।

সুবিমল রায় গল্প লেখা শুরু করেন পাঁচের দশকে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এক লেখক গোষ্ঠী তৈরী করেন। সেই গোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আনন্দময় বায়, অমল চক্রবর্তী, চিদানন্দ গোস্বামী, সুখময় ঘোষ প্রমুখ গল্পকার। এঁরা 'শিল্পী-বাসর' নামে একটি নতুন ধারার সূচনা করেন। তবে সে ধারার মধ্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না। 'কালিকলম' যুগের গল্পে যে হতাশা, অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা দেখা গিয়েছিল, 'শিল্পী-বাসর' তারই অনুবর্তন ঘটিয়েছে মাত্র। তবু ছয়ের দশকে যে সমস্ত লেখক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, সুবিমল রায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'যখন অন্ধকার হয়ে আসে'(১৯৬৭), 'যামিনীর ভালো থাকার শর্ত'(১৯৬৭),'মাধ্যাকর্ষণ' (১৯৬৯) ইত্যাদি গল্প বাস্তবধর্মী উপাদানের জন্য পাঠককে আকৃষ্ট করে। 'যখন অন্ধকার হয়ে আসে' গল্পে একটি বেকার যুবকের গভীর যন্ত্রণার

একটি বিশেষ মুহূর্ত চিত্রিত হয়েছে। তার কাছে প্রচলিত মূল্যবোধ সেই মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সুবিমল রায়ের 'অন্য পথ' গল্পে রয়েছে একটি মৃৎশিল্পীর কাহিনী। শিল্পী তার শৈল্পিক চেতনা ও কুশলী দক্ষতা নিয়ে প্রতিমা গড়ে তুললেও শিল্পীর পরিবারের জীবন্ত প্রতিমাগুলি অর্ধাহার অনশনে অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। এই গল্পে সমাজ জীবনের একটি ট্র্যাজিক দিক খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

'শিল্পী-বাসরের' অন্যান্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আনন্দময় রায় ও সুখময় ঘোষ। আনন্দময় রায়ের 'প্রেম'(১৯৬৬) লেখকের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। এখানে একটি নিটোল প্রথাগত নিশ্চিন্ত জীবনের পরিবর্তে চলমান জীবনের অনিশ্চিত গতিময়তা প্রাধান্য পেয়েছে।

সুখময় ঘোষের গল্পের স্বাদ একটু ভিন্ন ধরণের। তাঁর গল্পে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা স্থান পেয়েছে। কিন্তু লেখক সেই সব সমস্যার সমাধানের কোনো পথ বাতলে দেন নি, সে কাজটুকু পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর 'পড়ন্ত বেলায় ছায়া' গল্পে একটি কুমারীর পদস্খলন একজন বিবাহিত ব্যক্তির জীবনকে কীভাবে নষ্ট করে দেয়, তার ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর 'দুটাকার একটি সন্ধ্যা' গল্পে আছে মধ্যবিত্ত জীবনের সাধ আহ্লাদ। বেলা চাকুরী করে। ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। কারণ, তার দাদা বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে। একদিন বেলা অফিস যাওয়ার সময় সঙ্গে করে দুটো টাকা বেশী নিয়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার পথে তার সাধ হয়, ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য সে দুটাকার নলেন গুড়ের সন্দেশ কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু মিষ্টির দোকানে গিয়ে সে দেখলো সেখানে প্রচণ্ড ভীড়। সে দোকানদারকে সন্দেশ দেওয়ার জন্য বেশ জোর গলায় কয়েকবার অনুরোধ জানাল। কিন্তু পরক্ষণেই তার চিৎকার করে সন্দেশ চাওয়াটা তার নিজের কাছে খুবই কুৎসিত বলে মনে হল। তার মনে হল এইভাবে ভীড় ঠেলে, চেঁচামেচি করে, একবাজার লোকের সামনে খাদ্যদ্রব্য কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করার কোনো মানে হয় না। এইভাবে মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের অতি-সচেতনতার তুচ্ছ ও হাস্যকর একটি দিককে লেখক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

সাতের দশকে ত্রিপুরায় লেখা-লেখির জোয়ার আসে। এই সময় প্রচুর সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং এগুলির মাধ্যমে কবিতা ও প্রবন্ধের পাশাপাশি গল্প লেখার চর্চাও বেড়ে ওঠে। ছয়ের দশকের শেষের দিকে যে সব গল্পকার লেখা-লেখি শুরু করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাতের দশকে অনেকখানি পরিণত হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, কালিপদ চক্রবর্তী, মানস দেববর্মণ, কার্তিক লাহিড়ী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব লেখকের মধ্যে ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, পরীক্ষামূলক নতুন নতুন আঙ্গিক এবং সমাজ-নিরীক্ষার দিক থেকে নবচেতনার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি এই গল্পকার অকালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সমাজ সচেতনার জন্য তাঁকে রাজনৈতিক পীড়নের শিকার হতে হয়েছে। লেখক লেখা-লেখির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনে— উভয় ক্ষেত্রেই সংগ্রামী বৈশিষ্ট্যটি বজায় রেখেছেন।

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ত্রিপুরার সমাজ সচেতন গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ত্রিপুরার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসমস্যা, বিশেষত ত্রিপুরার উপজাতিদের অবহেলিত জীবনকথা রূপায়ণে একটি সার্থক ভূমিকার পরিচয় দিতে পেরেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার নতুন প্রজন্মের গল্পকারদের সমাজমুখী হয়ে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, অবসর বিনোদনের জন্য আরাম কেদারায় বসে কিছু বাস্তব-বহির্ভূত কল্পিত মানুষের জীবনকে উপজীব্য করে জীবন-বিমুখ ও রোমান্টিক গল্প লেখার দিন আর নেই। সাহিত্য মনোরঞ্জনের উপকরণ নয়, সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার বিশেষ। লেখককে তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ত্রিপুরায় অবহেলিত মানুষের জীবনের শরিক হয়ে তাদেরই গল্প লিখতে হবে। তিনি তাঁর এই বিশ্বাসকে নিজের রচিত গল্পের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে চিত্রিত হয়েছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ত্রিপুরী জুমচাষীর জীবন। কোনো কোনো গল্পে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের পটভূমিকায় সে দেশের আশা-আকাঙ্খাও স্থান পেয়েছে। আবার কিছু গল্পে রয়েছে আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের মূল্যবোধহীনতার সমস্যা এবং হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব অনুসন্ধানের আকৃতি। তাঁর দুটি গল্প গ্রন্থ 'সমিধ' ও 'বুড়া দেবতার মাচাং' পাঠককে নানাভাবে আকৃষ্ট করে।

'বুড়া দেবতার মাচাং' গল্পে ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ত্রিপুরী জুমচাষীর সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। একদিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে যত ফরেস্ট তৈরী হচ্ছে ততই একটির পর একটি জুমের টিলা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে উপজাতিদের অন্ন সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শত্রুঘ্ন তার একমাত্র সন্তান মঙলাকে শহরের মানুষ গড়ার কারখানায় পাঠিয়েছে। মঙলাকে সে আদি জীবনের অংশীদার হিসেবে দেখতে চায় না। কিন্তু মঙলা আর ফিরে আসে না। বৃদ্ধ শত্রুঘ্নকেও একদিন তার আদিম জুমচাষ-নির্ভর জীবনে ফিরে আসতে হয়। এখানে ত্রিপুরার উপজাতি-জীবনের সমস্যাগুলির কেন্দ্রে লেখক পৌঁছাতে পারেন নি। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের ফলে উপজাতিদের যৌথ ও সাম্যবাদী জীবনযাত্রা কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবার গড়ে উঠছে,— এই সমস্যার চেয়ে লেখক ব্যক্তি শত্রুঘ্নের সমস্যাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন।

একটি ভিখারীর আস্তানাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'উপরে পাখ-পাখালি এবং নীচে বিন্দু' গল্পটি। আস্তানাটি হল একটি গাছতলা। এক ভিখারীর সেটিই হল বাসস্থান। কিন্তু সরকারী বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকেরা এসে সেখানে একটি বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণ ঘর তৈরীর উদ্যোগ নেয়। ফলে সেই ভিখারীর শেষ আশ্রয়স্থলটিও নষ্ট হয়ে যায়। এখানে ভিখারীর সব হারানোর বেদনাই লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয়। 'বাঁশের বুকে ফুল' গল্পে যুক্তিহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই চালালেও সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে ওঠা যে সহজ ব্যাপার নয় — এইরকম একটি বক্তব্য স্থান পেয়েছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, বাঁশের ফুল হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। গল্পের নায়ক গৌরাঙ্গ সংস্কার বিসর্জন দিয়ে বাড়িতে মুর্গি পুষেছে।

কিন্তু সঙ্গে তার একটা ক্ষীণ অপরাধবোধও রয়েছে। তার আসন্ন-প্রসবা স্ত্রী জিলিপি খেতে চেয়েছিল। গৌরাঙ্গ ভেবেছিল মুর্গি বিক্রি করে তার সব সাধ-আহ্লাদ মেটাবে। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে মুর্গিগুলি শেয়ালের পেটে যায়। এখানে গৌরাঙ্গের মতো মধ্যবিত্তের প্রতি পাঠকের সমবেদনা আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর 'রাজা ভরত' গল্পটি একটু ভিন্ন ধরণের। এ যুগের রাজা ভরত সুখরাম তার বাবার জ্বরকে ক্যান্সার বলে মনে করছে। সে শহর থেকে অনেক দূরে একটি টিলার ওপরে বাস করে। এখানে কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার কোনো সুযোগ নেই। টিলা থেকে শহরে যাওয়ারও কোনো পথঘাট নেই। সুতরাং সে তার বাবাকে শহরে নিয়ে যেতে পারে না। তাই তার বাবার মৃত্যু অবধারিত। সেক্ষেত্রে জ্বরে আর ক্যান্সারে কোনো পার্থক্য থাকে না। 'কল্পিত স্বর ঃ নিঃসার বৃক্ষপত্র' গল্পে অসুস্থ নীলাঞ্জন বাংলাদেশের যুদ্ধোময় বিভীষিকার শ্বাস গ্রহণ করে নির্বাক হয়ে যায়। মৃত্যু চেতনা ঘুরে ফিরে তাকে আক্রমণ করে। মাঝে মাঝে অসংখ্য নক্ষত্রের ছবিল আকাশ তাকে জীবনের ঈপ্সিত আলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন সে শব্দের বর্ণালি ও বিচিত্র তরঙ্গের আঘাতে মৃত্যুর মতো এক নির্বোধ অভিধার সম্মুখীন হয়। এই গল্পটি চৈতন্য প্রবাহের রীতি অনুসরণে লেখা। তাঁর 'নাজমা মা হোল' গল্পটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। গল্পের নায়ক আব্দুল একজন শিক্ষক। সে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থক। তার স্ত্রী নাজমা আসন্ন-প্রসবা। পাকিস্তানী মিলিটারির অত্যাচারে সমস্ত বাংলাদেশ যখন ধর্ষিত, — এমনই এক সময়ে আব্দুলের বাড়িতেও মিলিটারি আসে। তখন নাজমার শুরু হয়েছে গর্ভযন্ত্রণা। এই অবস্থায় লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এবং সন্তানকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নাজমা গৃহত্যাগ করে নিভৃত আশ্রয়ের সন্ধানে এগোয়। কিন্তু পথেই এক গাছতলায় নাজমা মা হয়ে যায়। এখানে নবজাত বাংলাদেশের প্রতি একটি ইঙ্গিত রয়েছে। তাৎকালিক ভাবাবেগের বিচারে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। এছাড়া ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'সমিধ' নামক গল্প গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী সমাজ বাস্তবতার পবিচয় দিয়েছেন। এখানে 'তৃতীয় নয়ন', 'একটি সংবাদের জন্মকথা', 'সিঁড়ি বাওয়া' ইত্যাদি গল্প ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের গল্পকার হিসাবে মূল পরিচয়টি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

ত্রিপুরার গল্পকার হিসেবে কালিপদ চক্রবর্তী একটি বিশেষ স্থান দাবী করতে পারেন। তাঁর 'বিকেলের ময়দান' নামে একটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিকেলের ময়দান' গল্পে লেখক তাঁর পাঠককে এক গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। তাঁর 'ক্রীতদাস' গল্পের বাঁদর নাচ দেখতে দেখতে বিনয় নিজের অস্তিত্বের অবক্ষয় সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তার ধারণা হয় যে, সে নগর জীবনের মধ্যে আবদ্ধ এক ক্রীতদাস মাত্র। তাঁর 'বিমলা উপাখ্যান ও পরিণতি' গল্পটির গল্পরস এমনই জমাটি যে, পাঠক ধীরে ধীরে গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবনার মধ্যে ডুবে যান। কালিপদ চক্রবর্তীর গল্পে ত্রিপুরার মানুষের দুঃখ দুর্দশা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয় নতুন নতুন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে।
তার সমাজ সচেতনতা পাঠককে আকৃষ্ট করে,

তাঁর সমাজ সচেতনতা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

কার্তিক লাহিড়ী একজন আধুনিক গল্পকার। তিনি মূলতঃ কলকাতার 'পরিচয়' - গোষ্ঠীর লেখক। তাঁর গল্পে ব্যক্তির চেয়ে সমাজই বড়ো হয়ে ওঠে। তিনি পাঁচের দশক থেকে গল্প লিখে আসছেন। কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল 'আমার বাগানে এত ফুল', 'উট পাখি',' মহিম', 'রং', 'দুঃস্বপ্ন' ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি চৈতন্য প্রবাহের জটিল বিশ্লেষণী রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর গল্প পাঠককে বিষয়ের কেন্দ্রে আবদ্ধ করে। কিন্তু অনেক সময় তাঁর অনুসৃত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী রীতির গোলক ধাঁধায় চরিত্রগুলি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

ঋতেন চক্রবর্তী বিভিন্ন সময়ে যে সব গল্প লিখেছেন তাঁর মধ্যেও সমাজ-মনস্কতা খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প সংকলনের নাম 'সামনের দরজা'। ঝড়, বিপিনের সামনের দরজা, দরজায় শব্দ, অন্ধকারে গাঢ় শব্দ, ভুবন এবং অন্যান্য দল ইত্যাদি গল্প তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সুকৌশলী উপস্থাপনার গুণে পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে।

পরিশেষে মানস দেববর্মণ এবং বিমল সিংহের গল্পের উল্লেখ না করলে ত্রিপুরার গল্পকারদের সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। গল্পকার হিসেবে মানস দেববর্মণ অত্যন্ত সাহসী। তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প হলো 'স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী'। এই গল্পটি তাঁর 'দশটাকা পাঁচ টাকার গল্প' নামক সংস্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। এখানে লেখক আগরতলায় বসবাসকারী একটি ত্রিপুরী বেকার যুবকের পরিচয়গত ও অস্তিত্বগত সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। এই যুবকটি চাকরির দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে একটি জায়গায় এসে থেমে যায়। সেটা হল মাতৃভাষা। গল্পের নায়ক সৌগত ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে। তাঁর পিতা রাধাচরণ তাকে মাতৃভাষার কলমে ''বাংলা'' নামক শব্দটি লিখে দেওয়া পরামর্শ দেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা নামক বই খুলে ছেলে মেয়েদের ছবি দেখান। সেই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক মানুষের পাশে বালক রাধাচরণকে তিনি চিহ্নিত করেন। তিনি আরো বলেন রবীন্দ্রনাথ যখন ত্রিপুরায় এসেছিলেন, তখন তারা কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। স্মৃতিচারণ করতে করতে তিনি আরো বলেন— ''একডা থিয়েটার করছিলাম, বাংলা, তাতে আমি—''। সৌগতের আর ধৈর্য থাকে না, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রাধাচরণের পিতৃপুরুষ খাঁটি ত্রিপুরী হওয়া সত্বেও আগরতলায় এসে তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা ভুলে গেছেন। এখন তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। রাজন্য আমলেই স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ ভাষা হয়ে উঠেছিল বাংলা। রাজবাড়িতে এতদিন সাহিত্যচর্চা হয়ে এসেছে বাংলায়। সেসব কথা ভেবে আগরতলার ত্রিপুরীরা আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। কিন্তু আজকের দিনের সৌগতরা সেসব কথায় বিব্রতবোধ করে। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যখন সে প্রশ্ন শোনে—''তোমার মাতৃভাষা কি''? উত্তরে সে বলে— ''আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি''। তাকে আবার প্রশ্ন করা হয়— ''তোমার মাতৃভাষা কি?'' সে তখন বলে ''ত্রিপুরী''। ঘরভর্তি বিশেষজ্ঞরা হা-হা করে হেসে উঠে জানতে চায়— ''তুমি কি ত্রিপুরী ভাষা জানো'' সে আমতা আমতা করে বলে

—"না, শিখছি"। গল্পটির মধ্যে দিয়ে উপজাতি যুবকটির যে সংকট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা খুবই বাস্তব। এই সমস্যা তাই পাঠককেও বিচলিত করে।

বিমল সিংহের এ পর্যন্ত দুটি গল্প সংকলন বেরিয়েছে — 'আলোর ঠিকানা' এবং 'মনাইহাম'। 'আলোর ঠিকানা' গল্প গ্রন্থের 'রাইমা উপত্যকার উপকথা' গল্পটি পার্বত্য এলাকার উপজাতি জুমচাষীদের জীবন থেকে নেওয়া। এখানে আদিবাসীদের ওপর সরকারী অফিসারদের পীড়ন ও অত্যাচার এবং স্থানীয় মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের কথা স্থান পেয়েছে। যুগ যুগ ধরে অরণ্যের ওপর উপজাতি আদিবাসীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সরকারী অফিসাররা এসে ঘরবাড়ি সহ সমগ্র বাসস্থান থেকে তাদের উৎখাত করে দিয়ে বলে যে, এই জায়গা সরকারের, কোনো উপজাতির নয়। উপজাতিরা সংকল্প করে — "আমরা শহরের অফিস, আদালত অবরোধ করে এর প্রতিবাদ জানাবো। আবার আমবা একদিন এই গাঁয়ে ফিরবো; জ্বলে যাক সব কিছু, তবু আমরা নতুন করে বাঁচবো, আবার টং-ঘর নতুন করে বাঁধবো, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াবোই।" কিন্তু এই দুর্বল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই গল্পটিও ত্রিপুরার উপজাতি-জনজীবনের সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করতে পেরেছে। বিমল সিংহের 'জাবেদ আলির আজান' গল্পে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষের মর্মন্তুদ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর 'মনাইহাম' গল্প গ্রন্থের 'মনাইহাম' গল্পটির মধ্যেও উপজাতিদের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এখানে একটি পাখির খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ দুটি ময়না পাখির স্বাধীনতার আকাঙ্খার কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হলেও, এখানে রূপকের আড়ালে উপজাতি জনজীবনের শোষণ মুক্তির কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে।

সাত ও আটের দশকের গল্পকারদের রচনা নিয়ে যেসব সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'এই মাটি এই আকাশ' এবং 'ত্রিপুরার গল্প — উত্তর সত্তর'। এইসব সংকলনগুলির মধ্য দিয়ে বেশ কিছু নতুন লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন অশোক চক্রবর্তী, (এই আমার ভারতবর্ষ), রতীশ মজুমদার (নিগেটিভ) মানিক চক্রবর্তী (নিখিল এবং শব্দের হাতিয়ার), সুবিনয় শিকদার (যজ্ঞেশ্বরের ঘরে ফেরা), দুলাল উড়িয়া (অনুভব) প্রমুখ। এঁদের গল্পে বাস্তব জীবনের তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ এবং নিপুণ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া নিলিপ পোদ্দার সম্পাদিত 'ত্রিপুরার গল্প — উত্তর সত্তর' সংকলনটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। দীপক দেবের 'বুলডোজার', দেবব্রত দেবের 'যাত্রা' ও অসীম দত্ত রায়ের 'শয়তানের পাথর' গল্পে ব্যক্তির স্বস্থান থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়ার সমস্যা স্থান পেয়েছে। বাস্তব জীবনের করুণ ছবি আঁকা হয়েছে দুলাল ঘোষের 'শিকড়-বাকড়' ও অনুপ ভট্টাচার্যের 'ডাইনী' গল্পে। নিলিপ পোদ্দার তাঁর 'প্রস্তুতি' গল্পে এঁকেছেন সব হারানোর যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের এক কাহিনী। এছাড়া সুজয় রায় (দ্বিতীয় জন্ম, ঈশ্বরের মৃত্যু, আয়না, ক্রমশ অন্ধকার), সমরজিৎ সিংহ (একটি অবৈধ গল্প), অসিত দত্ত (পশু খামারের রূপকথা) কিছুটা কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। তবে এঁরাও

সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুগুলি স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন।

ছয়, সাত ও আটের দশকের আরো কয়েকজন গল্পকারের নাম উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু এদের অনেকেই আজ আর গল্প লেখেন না। যেমন — কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, খগেশ দেববর্মণ, ইরা চৌধুরী, অরুণোদয় সাহা, ননী কর, ননী চন্দ, শংকর বসু, অমিত শংকর দাসগুপ্ত, বিধুভূষণ দেব, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ভূদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ত্রিপুরায় গল্পকারদের রচনায় হয়ত বিশ্বমানের গল্প পাওয়া যাবে না, তবু আঞ্চলিক জীবনের সমস্যা সঙ্কুল প্রতিচ্ছবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এই গল্পগুলির মূল্য অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষতঃ দাঙ্গাবিরোধী, জীবন সংগ্রামের নানা পরিচয়বাহী এবং সর্বোপরি মানবিকতাধর্মী গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের পংক্তি ভোজনে যে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে সে বিষয়ে সংশয় নেই। ত্রিপুরার জীবনের গল্প ফুরিয়ে যায় নি। অভিজ্ঞতার আলোকে ত্রিপুরার গল্পকাররা দিন দিন নিজেদের আরো সমৃদ্ধ করে তুলবেন। পাঠকের কাছে সেই সব গল্প দ্বান্দ্বিক জীবনের বিশ্লেষণধর্মী এক চলমান ছবির আলেখ্য হয়ে উঠবে।

রাজ আমলের চিত্রকলা—স্মৃতিবিস্মৃতি

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ

ত্রিপুরায় জাতীয় শিল্প-রক্ষণশালা না থাকায় অতীতকে চাক্ষুস করবার সুবিধা নেই। যার ফলে শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিনির্ভর হতে বাধ্য। ত্রিপুরার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভেতরের শিল্পসম্পদ যা সকল শিল্প ইতিহাসের মর্যাদা বাড়াতে পারতো তা আর নেই। যদিওবা বিচ্ছিন্নভাবে দু'এক টুকরো সংগ্রহ করা আছে তাও সুসংরক্ষিত অবস্থায় নেই। কিংবদন্তি বা বই পত্রে ত্রিপুরার রাজাদের শিল্পানুরাগ ইতস্তঃত ছড়ানো আছে। কিন্তু হাতের কাছে, চোখের কাছে তুলে ধরার সুবিধা নেই বললেই চলে। যে ত্রিপুরার রাজারা সঙ্গীতে চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা বংশানুক্রমে করেছিলেন তাঁরা ভাবেননি উত্তরাধিকার সূত্রের কথা এবং শৌখিনতার ছদ্মবেশ তাঁরা পরেন নি একথাও ঠিক। কারণ পৃথিবীর সমগ্র রাজ ইতিহাসেই অসির ঝনঝনানি আছে আর সে সঙ্গে অবসর বিনোদনের সঙ্গী হিসাবে কাব্যলক্ষ্মী ও শিল্পসরস্বতীর সেবাকে তারা অপরিহার্য মনে করতেন। অবস্থাটি ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায়, মানুষ হিসাবে তারা নিজেদের উন্নত বলে মনে করতেন। তাঁরা প্রতিটি মানুষের স্বধর্ম রক্ষা করতেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে শূদ্র। একথা কেন বলছি তাঁরা নিজেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। কিন্তু ত্রিপুরার রাজারা মানুষ মাত্রই দ্বিজ একথা বোধহয় ভাবার সুযোগ পান নি। তাই শিল্পকলাকে জাত ও বর্ণানুসারে মর্যাদা দানের প্রয়াস ছিল বলে অত্যুক্তি হয় না। তাই ত্রিপুরায় বহু আগেই উচ্চশিক্ষা ও হাসপাতালের সুযোগ সম্প্রসারিত হলেও শিল্পকলার দুয়ারটি আবদ্ধ রেখেছিলেন নিজেদের মধ্যে। নিজেদের কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য তাঁরা বহিরাগত গুণীদের মর্যাদা ও সম্মান দান করতেন। তাই তাঁরা ত্রিপুরার মানুষের জন্য শিল্প-কলার প্রবাহকে তরঙ্গায়িত করতে মনোযোগী হননি। শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা রক্ষণশালা তৈরি করে রাজ-অন্তঃপুরের শিল্প-বৈভবকে বিলিয়ে দেন নি। অর্থাৎ চারুশিল্পের বোধোদয় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হোক, মানুষ দ্বিজ হোক, বিশেষতঃ কলা ক্ষেত্রে এই চাওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না। অন্যান্য রাজ্যে রাজাদের প্রাসাদোপম বাড়ীগুলি তাঁদের উত্তরাধিকারীরা দেশের শিল্প-রক্ষণ শালা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য দান করে গেছেন।

কিন্তু উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ তার গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে মানুষের কাছে। বীরচন্দ্রের উত্তরাধিকার যেমন রাধাকিশোর হয়ে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল —বীরবিক্রম মাণিক্যে এসে সেই সৃষ্টির স্রোতোধারা ক্ষীণ হয়ে কীরিট বিক্রমে একেবারেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আসলে শিল্পানুরাগ ও সক্রিয় চর্চার পেছনে সজ্ঞান মনের খেলার চেয়ে বেশী ছিল চিত্ত বিনোদনের ঝোঁক। এবং এই ঝোঁককে প্রশমিত করতে সবচেয়ে

সহায়তা করেছেন বীরচন্দ্র, বীরেন্দ্রকিশোর এবং বীরবিক্রম।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ স্থাপিত হয় রাধাকিশোরের সময়। রাধাকিশোরের ছিল বিজ্ঞান এবং সাহিত্যপ্রীতি। এই উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন বীরবিক্রম। দেশ বিদেশের নামকরা আঁকিয়েদের ছবি কিনেছেন যে কোন মূল্যে আর প্রাসাদের কক্ষের শোভা বাড়িয়েছিলেন। সে সব মনোরম চিত্ররাজি তৎকালের বহিবাগত চিত্রদর্শকরাও দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। স্থানীয় রসিকরা বঞ্চিত হননি। কারণ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর দেখার সুযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিৰ্দ্ধারিত ছিল।

প্রাসাদের দ্বিতলে চিত্র সজ্জিত থাকতো একটি মাঝারি কক্ষে, তিন পুরুষের বৃহদাকার তৈলচিত্র যথা- বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর। এই রাজাদের পূর্ণাবয়ব রাজ পোযাক-সজ্জিত চিত্রসমূহ ছিল ই, বি, হ্যাভেলের আঁকা। মাঝের বড় কক্ষে ছিল বড়দা উকিল, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শশি হেস প্রভৃতি শিল্পীর মূল্যবান চিত্র, সে সঙ্গে বীরেন্দ্র কিশোর অঙ্কিত 'সন্ন্যাসী', 'রাজসভায় দ্রৌপদী' ইত্যাদি তৈলচিত্র। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নব্যভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনও ছিল একাধিক। তাছাড়া রাজসভা শিল্পী অগ্নিকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, অনিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও সুরেশ চন্দ্র দেববর্মণের অঙ্কিত চিত্রসমূহও প্রাসাদ কক্ষের শোভা বাড়িয়েছিল।

রাজাদের শয়নকক্ষেও বিদেশী শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র শোভা পেত যা সর্বসাধারণের দেখার সুযোগ ছিল না। এভাবে সমগ্র দেয়ালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প নমুনা সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয়েছিল বীর বিক্রমের সহমর্মিতায়। তাছাড়া প্রচুর কারুশিল্পের নিদর্শন কোন কোন কক্ষে বিরাজ করতো। রাজা বীরবিক্রম সঙ্গীত ও চিত্রের অনুরাগী ছিলেন। পিতা বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন সক্রিয় শিল্পী। সৃষ্টির কাজ ও অনুপ্রেরণা দুই ছিল তার রাজসুলভ জীবনের অন্যতম ব্যতিক্রম। থিয়েটারের শখ ছিল প্রচণ্ড এবং প্রাসঙ্গিক দৃশ্য অর্থাৎ সীন্ (scene) আঁকতেন তিনি প্রবল উৎসাহে।

বীরেন্দ্রকিশোরের দুটি চিত্র মোটামুটি অনেকের নজরে পড়েছে। একটি হলো তার 'ঝুলন' অপরটি 'সন্ন্যাসী'। দুটিই তৈলচিত্র। ঝুলন চিত্রটিতে চমৎকার প্রাকৃত ঠাণ্ডা রঙে আঁকা। 'সন্ন্যাসী' চিত্রটি লালচে ধূসর গরম রঙে। পাশ্চাত্য তৈলচিত্রের অঙ্কন রীতির প্রভাব থাকলেও চিত্রের গঠন ভারতীয়। কাজের দক্ষতা নিখুত। তাছাড়া বীরেন্দ্রকিশোরের শিল্পকৃতির মেজাজ ফুটে উঠেছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায়। তাঁর বেশীর ভাগ নিসর্গ-চিত্র জনমানবহীন। মেঘের খেলা ও ঐশ্বর্য সে সব নিসর্গ-চিত্রের এক বিশেষ দিক। তৎকালের শিল্পী ও চিত্র অনুগ্রাহীরা তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে। এবং অনেকের পরামর্শে 'প্রবাসী'তে তার দুটি চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি বেরিয়েছিল। কিন্তু ছদ্মনামে। 'আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য' এই ছদ্মনামে। যশ বা খ্যাতি অর্জনের মোহে বীরেন্দ্রকিশোর ছবি বা সুর চর্চা করতেন না এ থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। বীরবিক্রম সুরেল কণ্ঠের অধিকারী, চিত্র দেখতেন কিন্তু হাত দিতেন না। পিতা বীরেন্দ্রকিশোর বাঁশী এবং সেতার বাজাতেন একাকী কিন্তু হাত দিতেন চিত্র রচনায়, এমনকি সকলের গোচরে সদলবলে। চারুশিল্প ও সঙ্গীতের

পাশাপাশি অবস্থান এই দুটি আমলকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছিল। যার কিছুটা প্রভাব তলে তলে ত্রিপুরার মানুষের অন্তরে স্মৃতি হতে পেরেছে।

কোলকাতায় বিখ্যাত সস্পেন্টার অগ্নি কুমার ভট্টাচার্য সাদা কালোর মুক্তার মতো প্রতিকৃতি আঁকতেন। তৈলরঙেও ছিলেন অভিজ্ঞ। বীরেন্দ্রকিশোর তাকে দীর্ঘ দিন মাসিক অর্থ সম্মান দিয়ে রেখেছিলেন। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শিল্পী শ্যামাচরণ চক্রবর্তী ত্রিপুরারই আদিবাসী শিল্পী। রাজ দরবারে ছিলেন আজীবন। ছবি এঁকেছেন রাজার রুচি ও নির্দেশে। মাপ জোক নিয়ে ছবি আঁকতে দক্ষতা ছিল কিন্তু শিল্পের স্ফুরণ মাঝে মাঝেই তার কাজে প্রকাশ পেয়েছিল। 'নদীর ঘাটে সান্ধ্যকালে রমণীর প্রদীপ জ্বালানো' চিত্রটি কাব্যিক উপাদানে গঠিত এবং চিত্রটি মাঝারি আয়তনের তৈলচিত্র। বীরেন্দ্র কিশোরের পত্নী প্রভাবতী ছিলেন পুণ্যশীলা মহিষী। পতির প্রেরণা অনুসারে তিনিও নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন সূক্ষ্ম টানে। জল রঙে আঁকা তার ছোট ছোট নিসর্গচিত্র খুবই উচ্চমানের এবং পরিশীলিত শিল্পরুচির পরিচায়ক।

মহেন্দ্রমোহন দেববর্মণের শৌখিন চিত্র অঙ্কন তৎকালে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর অঙ্কিত একটি রঙ্গীন চিত্রশিল্প প্রকাশ পেয়েছিল ''প্রবাসী'' পত্রিকায়। শয্যায় শায়িতা রমণী হাতে তাল পাখা বাস্তবধর্মী চিত্রের একটি উজ্জ্বল শিল্পকৃতি। শুনেছি তিনি কার্টুন জাতীয় চিত্রও রচনা করতেন যার কোন চিহ্ন বর্ত্তমানে খুঁজে পাওয়া ভার।

বীরেন্দ্রকিশোর দুহিতা রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর মধ্যে পিতার শিল্পানুরাগের ছাপ রয়েছে। যদিও শিল্প মেজাজ আধুনিক স্তরে বিধৃত। রাজকুমারী কমলপ্রভাদেবীর চিত্র রচনায় একটি স্বকীয় রীতি আছে। তার চিত্র বর্ণবহুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনার মাধুর্য বর্তমান। শিল্পের জন্য শিল্প রজনার আবেগ সঞ্জাত হলেও রঙের বিমিশ্রণে তার চিত্রানুরাগ পূর্ব্বসূরীদের প্রভাব পড়েনি।

অতীতের দিকে তাকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে একদা শোভিত চিত্রবাজিকে মনে হয় হারানো সম্পদ। যে সম্পদ শারীরিক মৃত্যুকে বাধা দিতে পারেনি। এবং খুব স্বল্পকালের মধ্যে নির্বাসিত হয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে যে শিল্প তেমন ধরণের শিল্প নিদর্শন ছিলনা বলেই আফশোস বেড়ে যায়। অনেক দেশেই রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক শিল্পকলা উচ্ছেদ হয়নি তার কারণ শিল্পের ইতিহাস হচ্ছে টেকনিকের ইতিহাস। সুতরাং টেকনিকগুলো অর্থাৎ আঁকার টেকনিকগুলো সর্বদাই অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকে। কারুশিল্প একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খুবই প্রভাবশালী কিন্তু চারুশিল্পের মহত্ব হচ্ছে তা সময়কে অস্বীকার করে যুগের প্রতিভূ হিসাবে বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকার জন্য সজ্ঞান শিল্প প্রচেষ্টা ত্রিপুরায় আবর্তিত হয়নি বলে জাতীয় শিল্প সংরক্ষণশালা গড়ে উঠেনি।

(দুই)

চিত্রকলার অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে আলোকচিত্রের প্রভাব ছিল। পাশ্চাত্যের চিত্রকলার প্রভাবে বীরচন্দ্র তৈলচিত্র অঙ্কন করতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বিবসনা নারীদেহের সুষমা অঙ্কনে এককালে সমগ্র বিশ্বেই চিত্রশিল্পীরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বীরচন্দ্রের অঙ্কন বিষয়ে এর প্রভাব ছিল কিন্তু তা প্রদর্শনের অঙ্গীভূত বলে বিবেচিত হয়নি। গুপ্তধন যেমন অজ্ঞাত থাকে, বীরচন্দ্রের চিত্র-নিদর্শন আজ সে পথেরই দিশারী। পরবর্ত্তীকালে বড় ঠাকুর বা সমরেন্দ্র দেববর্মা বিলাতী পদ্ধতিতে জল রং চিত্র অঙ্কন করতেন। দৃশ্য চিত্র আঁকতে ভালবাসতেন। সে সব চিত্রও নিশ্চিহ্ন। বীরচন্দ্রের অপর পুত্র মহেন্দ্র দেববর্মা জল এবং তৈলচিত্রে ছিলেন পারদর্শী। বাস্তবধর্মী চিত্র মূর্তি গড়ায় তার ছিল অপূর্ব দক্ষতা। এই ত্রয়ী শিল্পীর মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা ছিল পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকিশোরের মাধ্যমে মূর্ত্ত হয়েছিল পুরোপুরি। রাজকার্যের চেয়েও যার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল একটি শিল্পী মনের জগত। তাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল ফ্লোরেন্সের শিল্প জগত। গথিক এবং বাইজান্তিক শিল্পকলার মণ্ডনধর্মী শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না এবং প্রত্যক্ষভাবে ফ্লোরেন্সের রেনেসাঁ বা নব যুগের শিল্পকলার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন না বলা চলে। তবে একথা সত্য যে তিনি সে সব শিল্পের অপ্রত্যক্ষ গন্ধ পেয়েছিলেন। যার গন্ধ ও রঙের গঠন তাঁর তৈলচিত্রসমূহে স্থান পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সারা বিশ্বেই বিলেতী ছবির রাজত্ব। সুতরাং বীরেন্দ্রকিশোর সেই পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুসরণ করতেন। যেমন করেছিলেন শিল্পী রবি বর্মা। ভারতীয় প্রকৃতি, নিসর্গ ও বৈষ্ণব দর্শন তার চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল। যদিও প্রকাশভঙ্গী তাঁর অনুপম কিন্তু রঙের মেজাজ পাশ্চাত্যধর্মী ছিল। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা চিত্রকলা তাঁর নজরে এসেছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কালের পরিবর্ত্তন বীরেন্দ্রকিশোর চাক্ষুষ করেছিলেন যার আংশিক বিন্যাস তাঁর অর্ধ-সমাপ্ত চিত্র 'সূর্য প্রণাম'। রেখা ও রঙের আদর্শে ভারতীয়। রাজকক্ষের চার দেওয়ালে তাঁর শোভন ও মনোহর চিত্ররাজি একদা চিত্র রসিকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রচার বিমুখ ছিলেন বলে বীরেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরায় চিত্রচর্চার নবযুগ এনেও বিলীন হয়ে রইলেন। তাঁর ষ্টুডিয়োকে ঘিরে শিল্পীদের আনাগোনা হয়েছিল—যারা রাজপ্রাসাদে অঙ্কন শিল্পী হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তৎকালের কোলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী শশি হেস ত্রিপুরায় এসেছিলেন। শশি হেস ঠাকুর বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বীরেন্দ্রকিশোরের প্রতিকৃতি ও অন্যান্য চিত্র রাজপ্রাসাদ কক্ষে শোভা পেয়েছিল। সে সব চিত্ররাজি আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সংরক্ষণের জাতীয় মর্যাদার কথা ত্রিপুরার চিত্রামোদী জনগণ ভাবতে পারেন নি বলেই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে ঐসব চিত্ররাজি হয়তোবা ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে।

রাজ আমলে যেসব চিত্রশিল্পী ভারতীয় শিল্পের শিক্ষা করেছিলেন তাঁরা হলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, শৈলেশ চন্দ্র দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ভারতীয় শিল্পের রীতিনীতি অনুসরণ করে তারা ত্রিপুরার বাইরে সুনাম অর্জনের অধিকারী ছিলেন।

রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পী ত্রয়ী তাঁদের শিল্প প্রতিভার উন্মোচন করেছিলেন প্রথম জীবনে। বীরবিক্রমের সময়ে তারা নানা কাজে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মহারাজার শিলং

ও কোলকাতার রাজপ্রাসাদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ফ্রেস্কো রচনা করেছেন শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। 'ফ্রেস্কো' চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হিসাবে তিনি লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' ফ্রেস্কো রচনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের ফ্রেস্কো রচনার নিদর্শন রয়েছে। ইউনেস্কোর ব্যবস্থাপনায় অতিথি শিল্পী হিসাবে চীনা দেওয়াল ও গুহা শিল্প পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন কলা ভবনের অধ্যক্ষ পদে বৃত। আচার্য নন্দলালের বিশেষ প্রিয় ছাত্র হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনেই কর্মজীবন বেছে নিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রসমূহ রাজপ্রাসাদের কক্ষে ছিল না।

'রাজমালা' বিষয়ক মুরাল চিত্র অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই সিরিজ চিত্র ত্রিপুরার কাহিনী অবলম্বন করে আঁকা, তবে অঙ্কন রীতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। সেটি রাজ আমলে খুবই দৃষ্টি আকর্ষণকারী শিল্প হিসাবে অনুগৃহীত হয়েছিল। বীরবিক্রম চিত্রশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন চিত্রামোদী ও চিত্রের সংগ্রাহক। ফলে তাঁর আমলেই দেশী ও বিদেশী শিল্প নমুনা রাজপ্রাসাদে সংরক্ষণেব মর্যাদা পেয়েছিল।

বীরবিক্রম কিশোরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ত্রিপুরা' জাতীয় সম্মেলন' আয়োজিত - ''চিত্রপ্রদর্শনী'' ১৯৪৭ ইং সনের ২৩শে মার্চ রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সর্ব্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী এর আগে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হযনি। প্রায় ৩৮ জন শিল্পীর ১৬৭টি চিত্র উক্ত প্রদর্শনীটিতে স্থান পেয়েছিল। উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসাবে যাঁদেব নাম বলা যায তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বিনোদ মুখার্জী, রামকিঙ্কর, কে জি সুব্রাহ্মিনিয়ম, বিনায়ক মাসোজি, কৃপাল সিংহ, নন্দলাল বসু, ললিতমোহন সেন, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ, অর্দ্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ত্রিপুরাব মহাবাণী প্রভাবতী দেবীও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহারাণী প্রভাবতী দেবী ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোরের পত্নী। তাঁর অঙ্কিত চিত্রকলা হয়তো কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে।

ইতিহাস বদলে গেছে। বদলে গেছে প্রকৃতিব চেহারা। ত্রিপুরার রাজধানীর লাল কাঁকড়ের পথ হয়েছে পীচ মোড়া। দু'টি জল দিঘিকে সাক্ষী রেখে এখনো দাঁড়িযে আছে অর্দ্ধজীর্ণ প্রাসাদ যার নাম উজ্জয়ন্ত। এই নামটিও বর্ত্তমান ইতিহাস অস্বীকার করছে। হয়েছে বিধানসভা। প্রাসাদের শেষ উত্তরাধিকারীরা রাজকীয় প্রাসাদের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে বিক্রয় করে দিলেন, আত্মসাৎ করলেন অর্থ। কিন্তু যে প্রাসাদে একদা সঙ্গীত সাহিত্য ও চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকেরা ভীড় করতেন, ভীড় করতেন বাইরের পর্যটক তারা হলেন ধিকৃত এবং তাদের উত্তরসূরীরা হলেন শিল্প সংস্কৃতির সম্পদ থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনার বেদনা আজো অনুচ্চারিত। অনুচ্চাবিত ত্রিপুরার সম্পদশালী চিত্র-ঐতিহ্য ও শিল্প ধারার অবলুপ্ত প্রবাহ।

প্রত্ন-উপকরণে প্রাচীন ত্রিপুরা

রত্না দাস

ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক উত্থানপতন, সাল তারিখের বিবরণীই নয়, জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের বিভিন্ন দিকই আজ ইতিহাস বলে পরিচিত। সমকালীন সমাজ, শাসনতন্ত্র, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকেই যে কোন দেশের ইতিহাসকে খুঁজতে হবে তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের কোন লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নি, সেজন্য এর রচনায় শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন, রাজকীয় দলিলপত্রাদি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা উপকরণের উপর আমরা নির্ভরশীল। ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় উপ-মহাদেশের পূর্ব কোণে অবস্থিত ত্রিপুরা এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান। এখানকার কিংবদন্তী, গল্প-গাথা, সঙ্গীত, শিল্প সংস্কৃতির আলোচনায় মনে হয়, এক আদিম সভ্য জাতির ধারা বেয়ে ত্রিপুরগণ অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশিষ্ট কৃষ্টির সূচনা করেছেন এই পার্ব্বত্য ভূমিতে। এ ধারার উৎস কোথায়, কবে এর শুরু তার সিদ্ধান্ত আজও হয় নি। এ রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় নি। প্রাচীন বা মধ্যযুগের লিখিত কোন ইতিহাসও নেই। ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য কিছু রয়েছে বটে, কিন্তু তাহাও এককভাবে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। সেজন্য এ অঞ্চলের রাজকীয় উত্থান পতন, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস গঠনের কাজে প্রত্ন-উপকরণ অথবা পুরাকীর্ত্তির সহায়তা নিতেই হবে। প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য প্রত্ন-তথ্য ছড়িয়ে আছে ত্রিপুরায়। এরই প্রতিটি কথা সংগ্রহ করে রচনা করতে হবে ভারতেতিহাসে এই অলিখিত অধ্যায়। উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ত্রিপুরায় তো বটেই, অন্যত্র ও এ'নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক গবেষণা শুরু হয়েছে, যার ফলে ইতিহাসের বহু উপাদান আলোকে আসছে ও ত্রিপুরার ইতিহাসের নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে পারছি।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইতিহাসের প্রত্ন-উপাদানের কোন অভাব ত্রিপুরাতে নেই। কিন্তু জলবায়ুর প্রকোপ, আক্রমণকারীর ধ্বংসবিলাস ও প্রাচীন স্মৃতির প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যে অনেক পুরাকীর্ত্তিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আইন ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারাই এদের রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও অনুসন্ধান সবে শুরু হয়েছে। তাই ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আমরা এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। পুরাকীর্ত্তি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। আরও ব্যাপক অনুসন্ধান ব্যতীত ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ উপকরণ বা ধারাবাহিকতা

খুঁজে বের করা মুস্কিল। তবুও যে সমস্ত উপকরণ আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে প্রাচীন ত্রিপুরার বৈচিত্রপূর্ণ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বেশ কিছু চিত্র রূপায়িত হয়েছে। ত্রিপুরার আঞ্চলিক ইতিহাস এখন গঠনের পথে। এ ব্যাপারে কোন মৌলিক সিদ্ধান্তের অবতারণা বা আলোচনা করা এখনই উচিত নয়। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের কিছু পুরাতাত্ত্বিক উপাদানের আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ত্রিপুরার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু প্রত্ন-উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে, এই স্বল্প সময়ে যার পূর্ণ আলোচনা করা মুস্কিল। তাই খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ত্রিপুরার ইতিহাসের কিছু প্রত্ন-উপকরণ এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় বর্তমান ভূখন্ডে ঠিক কবে থেকে মনুষ্য বসতি শুরু হয়েছে অথবা অতি প্রাচীন কালে কি ধরণের শাসনযন্ত্র বা শাসনতন্ত্র এখানে প্রচলিত ছিল তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। ত্রিপুরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত যেখানে ভারতের মূল ভূখন্ডের সংস্কৃতি বিশেষ করে বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে আরাকান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির মিলন ঘটা সম্ভব, এবং হয়তো তা ঘটেছেও। কিন্তু বিক্ষিপ্ত দু'একটি উদাহরণ দিয়ে এ যোগাযোগের প্রকৃতি বা পরিধি নির্ণয় করা দুষ্কর। ত্রিপুরার জম্পুই, ডুম্বুর এলাকায়, এমন কি এই আগরতলার আশেপাশে অনুল্লেখ্য পরিমাণ প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে এগুলি সবই বিক্ষিপ্ত উপকরণ। প্রাগৈতিহাসিক tool-industry বলতে যা বোঝায় তার সন্ধান অথবা প্রাগৈতিহাসিক গুহা চিত্রের অবস্থিতি ত্রিপুরাতে আছে কিনা জানি না। উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানে যে ধরণের অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, ত্রিপুরাতে তার প্রচলন হলে এসব উপকরণ যে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। এই সামান্য উপকরণ নিয়ে ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে কোন মৌল সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তবে এটুকু বলা চলে যে বিক্ষিপ্ত পাথুরে প্রমাণগুলি আসাম নাগাল্যান্ডে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনেরই অনুরূপ।

প্রাচীন রাজকীয় দলিল পত্রাদি দেখে মনে হয় ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ প্রাচীন সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা অন্য কোন প্রকারে যুক্ত ছিল। আবিষ্কৃত কিছু শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ নর-জাতির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত, লোকনাথ, বৈদ্যদেব, শ্রীচন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্রের তাম্রশাসন দেবখড়গ মহারাণী প্রভাবতী দেবীর শিলালিপি ইত্যাদি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তবে এ সব দলিলে উল্লিখিত ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে বর্তমান ত্রিপুরার সীমারেখার অনৈক্য রয়েছে। বর্তমান ত্রিপুরার মাটিতে আরও উপকরণ না পাওয়া গেলে এ যোগাযোগ কি ছিল তা বলা মুস্কিল। এ সমস্ত রাজগণ কি প্রত্যক্ষ ভাবে ত্রিপুরাতে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন না ত্রিপুরা সামন্ত-রাজ্য হিসাবে এদের অধীন ছিল তা চিন্তা করা দরকার। ত্রিপুর রাজবংশ বিবরণী রাজমালার মতে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সময় থেকেই চন্দ্রবংশের অন্তর্গত বর্তমান রাজকীয় বংশ ত্রিপুরায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে যুধিষ্ঠিরের সময় বলতে হয়তো বহু

প্রাচীনকালকেই বোঝানো হয়েছে, এবং কথিত আছে এই বংশেরই এক নরপতি ৫৯০ খ্রীঃ অঃ ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে এই রাজবংশের ত্রিপুরায় আধিপত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত এমন কোন প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি, যা খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ত্রিপুরাতে মাণিক্য বংশের ধারাবাহিক আধিপত্য প্রমাণিত করে। যাই হোক, অনেকের মতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য প্রাচীনকালে ছিল না। হয়তো বা ভিন্ন ভিন্ন সামন্ত রাজগণ এ অঞ্চলে বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে চন্দ্রবংশীয় মাণিক্য রাজগণ স্বাধীন নরপতি হিসাবে ত্রিপুরাতে শাসনকার্য আরম্ভ করেন। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট প্রত্ন-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রাক্ পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনার কথা সবই অনুমান। যতক্ষণ না কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, অনুমানের উপর নির্ভর করে ইতিহাসের কোন মৌল সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় ঠিক নয়।

যাই হোক, রাজমালার আলোচনায় ফিরে আসা যাক। কেবলমাত্র রাজমালাকে ভিত্তি করে ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বচনা কবা যাবে না। তবে অনেকে রাজমালাকে ত্রিপুরার ইতিহাসের একান্ত অনির্ভরযোগ্য উপাদান বলে মনে করেন। ইতিহাসের আসরে রাজমালাকে এতটা অপাংক্তেয় করা বোধহয় ঠিক নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, পরিব্রাজকের বিবরণী, রাজপ্রশস্তি, রাজবংশ বিবরণী প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম যেমন ভারতেতিহাসের একমাত্র উপকরণ নয়, (ইতিহাসের মৌলিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে প্রত্ন উপকরণের সঙ্গে সাহিত্যের অবদানও মিশ্রিত করতে হবে), তেমনি মুদ্রা, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও অন্যান্য পুবাকীর্তি এবং রাজমালার সাহায্যে ত্রিপুরার মধ্যযুগের ইতিহাসের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। তবে রাজমালার সমর্থনে প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস-পরিচায়ক কোন প্রত্ন-বস্তুর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। তাই রাজমালা প্রসঙ্গ এখানে থাক।

প্রাচীন কয়েকটি রাজকীয় দলিলের কথা আগেই বলা হয়েছে যাতে ত্রিপুরার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে বহু প্রত্ন-উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। উপযুক্ত অনুসন্ধান ও খননের কাজ আরম্ভ হলে আবও অনেক মূল্যবান উপাদান আলোকে আসার সম্ভাবনা। এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে ইতিহাস রচনায় তার মূল্য বড় কম নয়। এদের মধ্যে পাথর, পোড়ামাটি ও ব্রোঞ্জের কারুকার্য, সীলমোহর ও মুদ্রাই প্রধান এবং মোটামুটি এগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গেই যুক্ত। প্রাচীন যুগের কোন শিলালেখ, তাম্রলিপি বা স্থাপত্য নিদর্শন ত্রিপুরার বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পাওয়া যায় নি। এ যুগের প্রত্নবস্তুগুলি প্রধানতঃ দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক, উদয়পুর ও অমরপুর অঞ্চল এবং উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটিতে পাওয়া যাচ্ছে।

মধ্য ও পশ্চিম পিলাক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমায় অবস্থিত। এখানে খনন কাজ চালাবার মত স্থান বয়েছে যার বিস্তৃতি খুব কম নয়। তাছাড়া এর আশেপাশেও ছড়ানোভাবে দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতে এখানে অনুসন্ধান চালালে ফলপ্রসূভাবে ত্রিপুবার প্রাচীন ইতিহাসের কিছু অংশ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

পিলাকের নানাস্থানে পাওয়া যাচ্ছে গুপ্ত পরবর্তী যুগের স্বর্ণমুদ্রা, ধর্মীয় অনুশাসনসহ পোড়ামাটির সীলমোহর, পাথর ও ধাতুর তৈরী বুদ্ধ, বোধিসত্ব এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়া পোড়ামাটির অলংকরণ, প্রাচীন মৃৎপাত্রের অংশ ও পুরাতন ইঁট প্রচুর পাওয়া যায়। গঠনশৈলী ও উপকরণ ব্যবহারের রীতি দেখে মনে হয় এ সকল বস্তু খ্রীস্টীয় ৭ম থেকে ১১শ-১২শ শতাব্দীর অন্তর্গত। প্রচুর পুরাতন ইঁটের সমাবেশে মনে হয় বেশ বৃহৎ কোন স্থাপত্য নিদর্শনও এখানে ছিল যা আজ ধ্বংসস্তূপেই পরিণত হয়েছে। প্রাপ্ত বস্তুর কিছু অংশ আগরতলার সংগ্রহ-শালায় রয়েছে, কিছুবা বিভিন্ন আশ্রম ও দেবালয়ে পূজিত হচ্ছে আবার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কিছু রয়েছে। প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ময়নামতী বৌদ্ধবিহারে পাওয়া দ্রব্যাদির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে মনে হয় ত্রিপুরার পিলাক অঞ্চলেও ময়নামতীর ন্যায় এক বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র ছিল। বালিপাথরে তৈরী বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-মূর্তিগুলির বিশালত্বে অনুমান করা যেতে পারে যে, জনপ্রিয়তা এবং আয়তনে পিলাক অপেক্ষাকৃত বড় বিহার ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তীর্ণ প্রভাব ছিল। বর্তমান ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল যে তৎকালে বৌদ্ধ সমতটেরই অন্তর্গত ছিল না তাই বা কে বলতে পারে? রাজমালার কোন অংশে বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি অথবা পৃষ্ঠপোষকতার কোন উল্লেখ নেই। রাজ পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত ধর্ম-সংস্কৃতির এত বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠা কি সম্ভব? কিন্তু কারা এর পৃষ্ঠপোষক সে প্রশ্নের জবাব দেবার মত কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির উপস্থিতিতে মনে হয় বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে তার প্রভাব পড়েছিল। যাই হোক এ সকল উপকরণ থেকে তৎকালীন অর্থাৎ ৭ম-১২শ শতকের ত্রিপুরায় বিশেষতঃ বাংলাদেশ সংলগ্ন ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলের ধর্ম সংস্কৃতির ইতিহাসের কিছু তথ্য আহরণ করা যাচ্ছে। অবশ্য এ যুগের স্থানীয় শাসনতন্ত্র ও রাজকীয় উত্থানপতনের ঘটনা এখনও অন্ধকারে। আশা করা যায় পিলাক ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকাজের ফলে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা যাবে। আলোচিত ভাস্কর্য ছাড়াও কিছু স্বর্ণমুদ্রা এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে যার সংখ্যা অবশ্য খুবই নগণ্য তবে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এরা অত্যন্ত মূল্যবান। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক ও তার কাছাকাছি সময়ে এ ধরণের মুদ্রার প্রচলন ছিল তৎকালীন বাংলায়। গুপ্ত রাজগণের পতনের পর সমতলে ও বঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই স্বাধীন নরপতিগণ গুপ্ত রাজগণের অনুকরণে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পিলাকে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি এধরণের মুদ্রারই অনুরূপ।

পিলাক থেকে কিছুটা উত্তরে উদয়পুর অঞ্চলে আবার দেখা যায় একটু ভিন্ন চিত্র। এখানে কালো "রাজমহল" পাথরে খোদাই পাল আমলের শেষ ভাগের অন্তর্গত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে বিষ্ণু, উমামহেশ্বর, দুর্গা, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। তবে এসব মূর্তির সঙ্গে ত্রিপুরার মূল ইতিহাসের কি যোগ আছে তা বলার

মত প্রামাণ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ্য, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পর উদয়পুর ত্রিপুরার মাণিক্য রাজগণের রাজধানী ছিল এবং এখানে তাঁদের নির্মিত বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে যাতে বর্তমানে কোন দেবদেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত নেই। এ সকল মূর্তি সেখানেই পূজিত হোত কিনা তাও একটা প্রশ্ন। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মূর্তিগুলির প্রায় সমস্তই পাওয়া গিয়েছে উদয়পুরে জলাশয়ে এবং একটি দুর্গামূর্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় কমলাসাগরে। এটাও চিন্তা করার বিষয়, এসব মূর্তি জলাশয়ে ফেলা হলো কেন? তা কি আক্রমণকারীর ভয়ে? তবে সে সব আক্রমণকারী কারা? এসব নানা প্রশ্নের জবাব দেবার মত তথ্য সংগৃহীত হলে ত্রিপুরার ইতিহাসের সমস্যা কিছু মেটানো যাবে।

উদয়পুরের কাছে অমরপুর নামক স্থানে কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় যার অধিকাংশই পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী সময়ের অন্তর্গত। তবে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত কালো পাথরে খোদিত বৃহদাকার মাতৃকা-মূর্তি (গড়ুর বাহিনী বৈষ্ণবী) গঠনে, বৈচিত্র্যে সত্যই অপরূপ এবং ভারতীয় মূর্তি তত্ত্বের ইতিহাসে এর জুড়ি মেলা ভার। মূর্তিটিকে চতুর্দ্দশ শতকের পরবর্তী সময়ের অন্তর্গত কিছুতেই বলা যায় না। এছাড়া এ অঞ্চলের গোমতী নদীতটে অবস্থিত দেবতামুড়া-পর্বত-গাত্রে খোদিত কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে যার গঠন বৈচিত্র্য দেখে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের অন্তর্গত বলে মনে হয়। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত হবার জন্য আরও প্রামাণ্য তথ্য প্রয়োজন।

উত্তর ত্রিপুরাতে আবিষ্কৃত প্রত্ন বস্তু আবার একটু অন্য ধরণের। প্রকৃতিগতভাবেও উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। এর সঙ্গে যেন কাছাড়ের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারোর মতে ত্রিপুরী ও কাছাড়ীগণ একই বংশ সম্ভূত। উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি একটি আকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র। আগরতলা থেকে প্রায় ১৮০ কিঃ মিঃ উত্তর পূর্বে কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত ত্রিপুরার তীর্থ ঊনকোটি। এই ঊনকোটি পর্বতমালার গায়ে খোদিত যে বিশালায়তন ভাস্কর্য শিল্পের সমাবেশ দেখা যায় সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে এর তুলনা মেলা দুষ্কর। ভারত শিল্পের এই গবেষণা ক্ষেত্রে উৎকীর্ণ ৩০/৩৫ ফিট উঁচু মূর্তিগুলি শিল্প তথা ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুকে অনেক কিছু ভাবার অবকাশ দেয়। কারা এর নির্মাতা কেন এটি তৈরী হয়েছিল তা এখনও প্রায় অপাঠ্যই রয়েছে। প্রাকৃতিক কারণেই স্লেট ও বালিপাথরে তৈরী এই বিপুল শিল্প সম্ভার প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ঊনকোটি শিল্পক্ষেত্রের বিশাল ব্যাপ্তি দেখে মনে হয় এখানে অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু একটি তীর্থকেন্দ্র ছিল। কখন এর জন্মলগ্ন, কবে এটি পরিত্যক্ত হল বলা মুস্কিল। পাহাড়ে খোদিত বিশাল মূর্তিগুলির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভারতীয় মূল শিল্পধারার সঙ্গে মেলে না বরং নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের শিল্পরীতির সঙ্গে যেন এর কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মনে হয় ঊনকোটির শিল্পধারা একান্তই স্থানীয়, তাই এতে ভারতের মূল শিল্পরীতি অপেক্ষা মঙ্গোলীয় শিল্পের প্রভাবই বেশী। এই বিশাল মূর্তিগুলি দেখে ঊনকোটির কাল নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্গত হলেও

এর গঠন শৈলী স্থানীয় লোকায়ত শিল্পেরই অনুরূপ। আদিম লোকশিল্প বা Primitive art-কে অনেকেই ageless বা কালহীন বলে বর্ণনা করেছেন। তবে ঊনকোটির ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা সৌভাগ্যবান এই কারণে যে হিন্দু দেবদেবীর কিছু মূর্তি ঊনকোটিতে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যাচ্ছে যা পাথরে খোদিত মূর্তিগুলি থেকে অন্যরকম। গঠনরীতি অনুযায়ী এগুলি পাল সেন যুগের অন্তর্গত। এই তথ্যে, অনুমান করা যেতে পারে পাহাড়ের গায়ে খোদাই মূর্তিগুলিও একই সময়ে উৎকীর্ণ। তবে এদের সমসাময়িকতা এখনও সন্দেহাতীত নয়। যাই হোক, ঊনকোটি যে এক সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক বর্দ্ধিষ্ণু কেন্দ্র ছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে বা কারা এর পৃষ্ঠপোষক তাব উল্লেখ কিন্তু ঊনকোটি গাত্রে কোথাও নেই অর্থাৎ এখনও জানা যায় নি। (রাজমালায় অবশ্য ঊনকোটির উল্লেখ রয়েছে)। এমনও হতে পারে সেন যুগে বাংলার হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে জনপ্রিয় করার জন্য এবং সাধারণের মন থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দূর করার জন্য রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঊনকোটির পর্বত গাত্রে দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল ও সম্ভবতঃ এই কাজে তৎকালীন মূর্তিতত্ত্বের কঠোরতা হ্রাস করে স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল এবং খোদাই কাজে নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থানের তৎকালীন তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাবও যে কিছুটা পড়েছিল সন্দেহ নেই। ঊনকোটিতে শিব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীরই প্রাধান্য দেখা যায়। যাই হোক, মনে হয় ঊনকোটির পার্বত্য এলাকায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এখনও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঊনকোটি শিবের পূজা প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার ইতিহাস রচনায় ঊনকোটি শিল্প সম্ভার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মৌল পাঠোদ্ধার না হলে এ অঞ্চলের ইতিহাস মূকই রয়ে যাবে। ঊনকোটি ব্যতীত উত্তর ত্রিপুরাতে উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

আলোচিত উপাদানগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রাচীন স্থাপত্য বা রাজকীয় দলিল পত্রাদিও এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। উপযুক্ত অনুসন্ধান ব্যতীত এদের পাওয়াও সম্ভব নয়। আলোচিত উপকরণের উপস্থিতি দেখেই বোঝা যায় শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান ত্রিপুরায় পাওয়া সম্ভব। এবং এই উপাদান সংগ্রহে উপযুক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সুষ্ঠু অনুসন্ধান হলে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ইতিহাসের গুণ্ঠন মোচনে সফল হতে কোন বাধা থাকবে না।

ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার গতি ও প্রকৃতি

বামাপদ মুখোপাধ্যায়

ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার গতি ও প্রকৃতি যে কোন মৌলিকতার দাবি করতে পারে না এ কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েও এ প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যে সারা বিশ্বে নাট্য চর্চার গতি ও প্রকৃতি কি একই সুরে বাঁধা নয়? আজ থেকে প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে যখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই হয় তখনও দেখা যায় গ্রীস দেশে যদি Rhythmos ও melos অর্থাৎ কিনা নৃত্যের ছন্দে ও সঙ্গীতের সুরের সাহায্যে logos এর মাধ্যমে stasimon ও Episodian এই দুই পর্যায়ে নাটক পরিবেশিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের এই ভারতবর্ষেও গানের সুরে আবৃত্তির মাধ্যমে ও নাচের ছন্দে ভাবাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দৃশ্যকাব্য পরিবেশিত হতো। পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের তাত্ত্বিক Aristotle আর প্রাচ্য রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ভরতমুনির মূল কথা একই। বাস্তবানুগতার চাহিদায় সাড়া দিতে দিতে পাশ্চাত্য দেশে যেমন তিনদিক ঘেরা Prosenium Theatre এর জন্ম হয়েছে, প্রাচ্যেও সেরকম যাত্রা নৌটঙ্কির খোলা মঞ্চ ছেড়ে থিয়েটার হলের তিনদিক ঘেরা স্টেজের প্রচলন হয়েছে — যদিও এই পরিবর্তনটা পশ্চিমের প্রভাবমুক্ত নয়। যাই হোক, মোট কথা হলো সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয় তারই সাথে তাল রেখে Performing art-ও তার রূপ পরিবর্তন করতে থাকে। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যতই কাছাকাছি আসতে শুরু করে ততই তাদের performing art গুলি স্বকীয়তা হারাতে থাকে। তাই ত্রিপুরার নাট্যচর্চা যদি কোন মৌলিকতার দাবী না করতে পারে তাতে আমাদের হীনমন্যতার কোন কারণ নেই। আক্ষেপ শুধু এটাই যে এরাজ্যে যারা আদি বাসিন্দা, অর্থাৎ কিনা আমাদের উপজাতি ভাইরা, নৃত্যে যেমন ত্রিপুরায় তাঁদের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আজও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন (যা মিজোরামের কিম্বা নাগাল্যাণ্ডের উপজাতীয়রা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন) নাটকে তাঁরা সেরকম একটা প্রায়োগগত মৌলিকতা কেন গড়ে তুলতে পারলেন না?

(২)

আক্ষেপটা প্রকাশ করার আগে আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে নৃত্য ও সঙ্গীত জন্ম নিয়েছে আগে আর নাটক এসেছে অনেক পরে। অনুকরণ বা mimesis মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এই অনুকরণের ঝোঁক থেকেই মানুষ পাখীর মতো, ঝর্ণার মতো নেচেছে, বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণে স্বর প্রক্ষেপণ করেছে। তার থেকে জন্ম নিয়েছে ছন্দোবদ্ধ নৃত্যের আর সুরেলা সঙ্গীতের। সভ্যতা যখন স্থিতিশীল হয়েছে, মানুষ যখন পেয়েছে কর্ম থেকে অবসর, মেতেছে উৎসবে, তখন সমবেত শ্রোতার সামনে নৃত্য-গীত- সংলাপ সমৃদ্ধ

কাহিনী আশ্রিত নাটক হয়েছে রচিত ও পরিবেশিত। 'নান্দী' অন্তে সূত্রধার আসরের মাঝে নট-নটীকে ডেকে বলেছে, 'আজ্ঞাপিতো অস্মি পরিষদা'। সে তো অনেক পরের কথা। যাযাবর উপজাতীয় জীবনে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। আমাদের উপজাতি ভাইরা যদি তাই নৃত্য-গীতে স্বকীয়তা অর্জন করলেও ঐ দুয়ের সংমিশ্রণে ও সংলাপের সংযোজনে যে নাটক রচিত হয় তাতে মৌলিকত্ব অর্জন করার সুযোগ না পেয়ে থাকেন, তাহলে আক্ষেপ করতে গেলে দোষী করতে হয় তাঁদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বে ছিলেন, অর্থাৎ কিনা শাসককুলকে। এ রাজ্যের রাজন্যবর্গকে। কারণ যুগ যুগ ধরে দেখা যাচ্ছে শাসক শ্রেণীর জীবন কাহিনী, ধ্যান ধাবণা, আশা আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হয় নাটকে। রাজ-বাজারা যেদিন নাটকেব একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেদিন রচিত হয়েছে O edipus Rex, Electra, কিম্বা Hemlet, King Lear, কিম্বা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম। সামন্তযুগেব প্রভাব কমে আসা আর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যের সাথে সাথেই রাজবাড়ী থেকে নাটক চলে এসেছে Public Theatre- এ আব তাব বিষয়বস্তু হয়ে গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে Sentimental Drama আর ঊনবিংশ শতাব্দীব বাংলাব অবক্ষয়িত সামন্ত মূল্যবোধেব ওপর বিদ্রুপাত্মক 'প্রহসন' — মাইকেলেব 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিম্বা দীনবন্ধু মিত্রেব 'সধবার একাদশী'। প্রযোগেব বীতিও হয়ে গেছে অনেক বেশী বাস্তবানুগ। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক যখন ছিলেন সামন্ত রাজাবা তাঁদের উচিত ছিল নিজের ভাষায় নিজের উপজাতীয় লোক-আঙ্গিকে নাট্য চর্চাব জন্ম দেওযা। কিন্তু তাঁরা অনুকরণ করলেন প্রতিবেশী বাজ্য ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গদেশেব নাট্যচর্চাকে। তাই আজও ত্রিপুবার নাট্য চর্চা বলতে মূলতঃ বাংলা ভাষায লেখা ও কোলকাতার প্রয়োগরীতির অনুকরণে পবিবেশিত নাটকের চর্চাকেই বোঝায়। বিগত দুই তিন দশক ধরে দেখা যাচ্ছে ককবরক ভাষায় নাট্য চর্চার একটা উদ্যম নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের অভাবে তা আজও ভালভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। তাই ত্রিপুবায নাট্য চর্চার কথা বলতে গিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা ও মূলতঃ কোলকাতাব প্রয়োগরীতি অনুকরণে পরিবেশিত নাটকের চর্চার কথাই বলতে হয়।

(৩)

১৯৭৫ সালে ত্রিপুবা সবকাবেব জন সংযোগ ও পর্যটন অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ সংকলনে শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য 'ত্রিপুরায় বাংলা নাট্যচর্চা' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে ও বিংশ শতকের শুরুব দিকে ত্রিপুরায বাংলা ভাষায় যে নাট্যচর্চা হতো তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। (১) ত্রিপুরায় নাট্য চর্চাব মণিপুরী গীতি নাট্যের প্রভাব ও (২) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে মূলতঃ মহারাজাবই উদ্যমে গৌড়ীয় ও মণিপুরী রীতির সমন্বয়ে সৃষ্ট কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা নৃত্যগীত ও অভিনয়েব মাধ্যমে মঞ্চায়ন — ত্রিপুরার নাট্যচর্চার বিষয়ে শ্রী ভট্টাচার্যের এই দুইটি উল্লেখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, ''ত্রিপুরায় মণিপুরী গীতি নাট্যের আবির্ভাবের মূলে প্রতিবেশীসুলভ নৈকট্যই একমাত্র হেতু ছিল না, উভয় রাজ্যের মানুষদের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা, ধর্মপ্রবণতা ও রুচিবোধের সমতা এবং

উভয় রাজ্যের রাজ পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি কারণে প্রধানতঃ ত্রিপুরায় মণিপুরী সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।'' শ্রী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকেই আরও জানতে পারি ত্রিপুরার নাট্য চর্চায় রাধাকিশোর মাণিক্যের অবদানের কথা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য মুখ্যতঃ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হলেও শ্রী ভট্টাচার্যের মতে তিনি যাত্রাভিনয়, কবির লড়াই ও প্রচলিত লোক নাট্যের চর্চার পৃষ্টপোষকতাই করেছেন বেশী। আগরতলায় কাঁসারি পট্টির ও আচার্য পাড়ার যাত্রাপার্টি নামে দুটি আধা পেশাদারী নাট্য সংস্থার জন্ম হয় এই সময়ে। তাদেরই প্রভাবে আদিবাসীদের মধ্যেও গড়ে উঠে দু-একটি যাত্রাদল যারা বাংলা ভাষাতেই যাত্রা মঞ্চস্থ করতেন।

রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে এই যাত্রাভিনয় হলো ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় নাট্য চর্চার দ্বিতীয় পর্যায়। কারণ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা গান থেকেই নাট্যচর্চার শুরু। পাশ্চাত্যরীতির রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় হলো ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার তৃতীয় পর্যায়, যা শুরু হয় রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় থেকেই। 'উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে এবং কোলকাতার স্টার থিয়েটারের প্রয়োগরীতির অনুকরণেই তারা নাট্যাভিনয় করতেন। মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মা রচিত 'পতিব্রতা' নামের পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের নাট্যচর্চা শুরু। পরবর্তী নাট্যানুরাগী বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করেন। শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য দিয়েছেন এবং সেটি হলো 'পতিব্রতা' নাটক রচনার পর ত্রিপুবার দ্বিতীয় মৌলিক নাটক রচনা 'ত্রিপুর গৌরব'। নামটি শুনেই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার গৌরব' নাটকের অনুকরণেই নিশ্চয় নাটকটি লিখিত হয়েছিল। লেখকের নাম শ্রী ভট্টাচার্য দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি এ তথ্য দিয়েছেন যে, উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে এবং এই নাটকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আজ আর উপলব্ধ নয়। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময়ে তাঁরই উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য সংস্থা, যার নাম 'পুষ্পবন্ত নাট্য সমাজ'। ১৯১৭ সাল থেকে যে কয়টি নাট্য দল গড়ে ওঠে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেবুকর্তা ওরফে কুমার ব্রজবিহারী দেববর্মার নাট্যদলটি। কারণ সাধারণ নাট্যাভিনয়ে কত বিচিত্রভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত ইত্যাদিকে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতো এই দলটি। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ষাটের দশকে বিপিনকর্তা, বঙ্কিমকর্তা ও রাণা দহাল জংকে নাট্য প্রযোজনায় আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগে ঐ একই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেখেছে এবং আজ মনে হয় তাঁরা সম্ভবতঃ ছিলেন কুমার ব্রজবিহারী দেববর্মার পরীক্ষা নিরীক্ষার উত্তরসূরী।

(৪)

১৯২৩ সাল থেকে রাজানুকূল্য নির্ভরতা ছেড়ে দেয় ত্রিপুরার নাট্যচর্চা এবং মূলতঃ তরুণ ছাত্ররা গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব কয়েকটি নাট্য সংস্থা। উমাকান্ত একাডেমী ছাত্র নাট্য সংস্থা, এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের থিয়েটার, শ্রী পাটের তরুণ সংঘ,

স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের নাট্য শাখা, বিলোনীয়ার ছাত্র নাট্য সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেছেন শ্রী অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়।

প্রবন্ধের একস্থানে শ্রী ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন — স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের প্রভাবে রাজধানীতে এবং ত্রিপুরার কয়েকটি মহকুমা শহরে কয়েকটি সৌখিন থিয়েটার দল সংগঠিত হয়। ত্রিপুরার দীর্ঘকালীন প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ধারাকে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে সাধারণের আঙিনায় নিয়ে আসেন স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের অভিনেতা ও নাট্যকর্মীরাই। স্বল্পব্যয়ে শোভন মঞ্চসজ্জায় অভিনয় চর্চার রীতি প্রবর্তন করেন তাঁরাই, যার ফলে অন্যান্য নাট্য চর্চার পথও সুগম হয়ে যায়। ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন ১৯২৮ সালে। তিনিও ছিলেন পরম নাট্যানুরাগী ও নাট্যোৎসাহী। রাজপদে আসীন হওয়ার আগে থেকেই তিনি নাট্য চর্চায় ব্রতী ছিলেন এবং অবলুপ্ত প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে 'ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী' নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠন করেন। বাংলা ও মণিপুরী নাচ, গান ও বাংলা সংলাপের সমন্বয়ে তিনি কয়েকটি গীতি নাট্য রচনা করেন যার মধ্যে 'চাঁদ কুমুদিনী' ও 'শ্রী রাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে কোলকাতায় 'ত্রিপুর হাউসের' মঞ্চে সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছিল 'শ্রী রাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাস' নামে মহারাজা বীরবিক্রম রচিত গীতিনাট্যখানি ও রসিক সমাজে সেই প্রযোজনা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ১৯২৬ সালে মহারাজা বীর বিক্রম রচনা করেন একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জয়াবতী' বা 'ত্রিপুরসতী'। বাংলায় রচিত এই নাটকের একটি দৃশ্য উপজাতীয় 'হালাম' ভাষার ব্যবহার আছে হালাম সর্দারের মুখে। এর থেকে বোঝা যায় এক ভাষায় রচিত নাটকে অন্য আব একটি ভাষার ব্যবহারে মহারাজা বীরবিক্রমের আপত্তি তো ছিলই না বরং বাস্তবানুগতার প্রয়োজনে তিনি সেটি সঠিকই মনে করেছিলেন। তাই আক্ষেপ জাগে কেন তিনি নিজ মাতৃভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক বচনা করলেন না যার মধ্যে প্রয়োজনে তিনি বাংলা ভাষাও ব্যবহার করতে পারতেন।

শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে আরও একটি মূল্যবান তথ্য পাই এবং তা হলো ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ের রচিত চারটি নাটকের অস্তিত্বের কথা। 'বাংলাদেশের মাটি', 'আর্য-অনার্য', 'ত্রিপুর গৌরব' এবং 'চিতোর সন্ধ্যা'। এই চারটি নাটকের মধ্যে একমাত্র 'বাংলাদেশের মাটি' নাটকটিই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অন্যগুলি ছোটদের দ্বারা অভিনয়ের জন্যই রচিত হয় ও পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে যায়।

(৫)

ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি ও দেশভাগের ফলে অগণিত বাঙালী উদ্বাস্তুর এ রাজ্যে আগমন — এই তিন তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব অবধারিতভাবে ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ওপরও পড়ে। কুমিল্লার চাকলা রোশনাবাদে ত্রিপুরার মহারাজার জমিদারী থাকার সুবাদে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ রাজ্যের নিবিড় যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার ফলে ত্রিপুরার রাজ পরিবার বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি শুধু যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

তাই নয়, ঐ ভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণে এবং নিজেদের রাজ্যে ঐ ভাষাকে রাজভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কৃতকার্যও হয়েছিলেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা প্রথম স্বীকৃত হয় এই রাজ্যে। যাই হোক, স্বাধীন ভারতের এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোতে ঔপচারিকভাবে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্থান থেকে অগণিত শরণার্থী আগমনের ফলে উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ায় ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় মূলতঃ বাঙালী সমাজ, বাঙালী সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশীয় মূল্যবোধই প্রতিফলিত হতে থাকে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবনের প্রতিফলন যত নগণ্যভাবেই হোক না কেন যতটুকুও বা বিধৃত ছিল এই রাজ্যের নাট্যচর্চায়, তাও এবার অবলুপ্ত হলো। এ ব্যাপারে দায়িত্ব অবশ্যই বর্তায় সেদিনের শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান উপজাতীয় সমাজের ওপর। নিজেদের সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হওয়ার কথা বলছি না — ববং বলবো যে, খোলা মন নিয়ে যে আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা সেদিন বিপন্ন শবণার্থীদেব পুনর্বাসিনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসা ও অনুকরণের যোগ্য। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অন্য আর একটি বিকশিত সংস্কৃতির ভালটুকু নেওয়ার মানে এই নয় যে নিজের সংস্কৃতিব স্বকীয়তা বিসর্জন দেব। সেদিনের শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান উপজাতীয় সমাজ নিশ্চয় পারতেন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির ভালটুকু গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজেদেব ভাষা-সংস্কৃতির মৌলিকত্বটুকু বজায় রাখতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তও তো উপলব্ধি কবেছিলেন —

'হে মাতঃ ভাণ্ডাবে তব বিবিধ বতন
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা কবি
পরধন লোভে মত্ত কবিনু ভ্রমণ'

পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি যখন ঊনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ক্রমশঃ গ্রাস কবতে শুরু কবেছিল তখন ববীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে বিভিন্ন সংস্কৃতিব মিলনক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, এই ভারততীর্থে আর্য-অনার্য, দ্রাবিড়-চীন, পাঠান-মোগল সবাই এক দেহে লীন হয়েছে এবং আজ যদি পশ্চিম তার দ্বার খোলে দিয়ে থাকে এবং অনেকে সেখান থেকে উপহার আনতে থাকে তাতে আপত্তির কিছুই নেই। খালি মনে রাখতে হবে শুধু নেওয়া নয়, দেওয়াও মানব ধর্ম — 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে', এই হলো একটি দেশকে তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার চাবিকাঠি। অতএব স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে ত্রিপুরারও উচিত ছিল রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যেও যে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যটুকু টিকেছিল তাকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হওয়া। এবং তা যদি কবা হতো তাহলে আজ আমরা দেখতাম নাট্যচর্চার জগতেও রয়েছে ককবরক ভাষায় রচিত নাটক যার একটি বিশিষ্ট মঞ্চায়ন পদ্ধতি আছে। হয়তো দেখতাম চাকমা ভাষায় রচিত নাটকের বিশেষ প্রযোজনারীতি এবং এরকম আরও অনেক কিছুই যা ভারতীয় সংস্কৃতির আঙিনায় ত্রিপুরাকে 'পশ্চিম বাংলার ছায়া' হিসেবে নয়, 'স্বমহিমায় উজ্জ্বল' একটি রাজ্য হিসেবে স্থান করে দিত।

(৬)

যাই হোক স্বকীয় কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও ত্রিপুরার নাট্যচর্চা যে একেবারে মূল্যহীন

সেকথা বলা যায় না, বিশেষ করে যখন দেখি ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই এ রাজ্যে নৃত্যগীত সংলাপ সহযোগে অপেরাধর্মী নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল। এবার আসি আর একটি বিশেষ ধরণের নাট্যচর্চা বিষয়ে — সেটি হলো রবীন্দ্রনাট্যের চর্চা। এ ব্যাপারে ত্রিপুরা সম্ভবতঃ পশ্চিম বাংলার থেকেও বেশী কৃতিত্বের দাবীদার। ত্রিপুরায় রবীন্দ্র নাট্যের চর্চা বিষয়ে শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় তাঁর 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র সংস্কৃতি' পুস্তকে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ১৯০৪ সালে রাজবাড়ীতে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর গৃহে মহারাজকুমার বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিসর্জন' নাটকের মঞ্চায়ন। ১৯০০ সালে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সম্মানে কোলকাতায় 'সঙ্গীত সমাজ' নামক সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রীটস্থিত বাড়ীতে 'বিসর্জনের' প্রযোজনা মহারাজ কুমার বীরেন্দ্র কিশোরকে খুবই অভিভূত করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯০৪ সালে ত্রিপুরার মঞ্চে প্রথম রবীন্দ্র নাট্যের প্রযোজনা।

'বিসর্জন' নাটকটি — যা ত্রিপুরার পটভূমিতে ত্রিপুরার রাজপরিবারকে আশ্রয় করে লেখা — ত্রিপুরার মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। মহারাজকুমার কর্ণ কিশোর দেববর্মার তত্ত্বাবধানে গঠিত 'ত্রিপুর যুবক সমিতি' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন ১৯৩০ সালে। ১৯৪২ সালে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন সুধাংশু মোহন দত্ত মহাশয়ের পরিচালনায়। ১৯৫০ সালে 'নারী গ্রন্থাগার' স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ঐ সংস্থারই সদস্যরা 'বিসর্জন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন সুধাংশু মোহন দত্তেরই পরিচালনায়।

তারপর ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে 'বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ', ১৯৬১ সালের জুন মাসে 'রসচক্র সংস্থা'র সদস্যবৃন্দও ঐ বছরের ঐ মাসেই 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' বিসর্জন নাটকটি মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। ১৯৬২ সালের মে মাসে 'বিসর্জন' নাটকের ইংরাজী ভাষায় রূপান্তর 'স্যাক্রিফাইস' (যা কিনা রবীন্দ্রনাথের আরেকটি মৌলিক নাটকই বলা যায়) অভিনীত হয় ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকারের প্রয়োজনায়। এছাড়া ত্রিপুরার আরও বহু নাট্য সংস্থা ত্রিপুরার ভেতরে ও বাইরে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে রক্তকরবী, তপতী, রাজা, চিরকুমার সভা, মুকুট, মুক্তধারা, কালের যাত্রা বা রথের রশি, বৈকুণ্ঠের খাতা, মুক্তির উপায় ইত্যাদি নাটক ত্রিপুরার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে একাধিকবার। নৃত্যনাট্যগুলির কথা ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ও কবিতার নাট্যরূপ মঞ্চায়নের কথা আর উল্লেখ করলাম না। সেগুলির হিসাব দিলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অবলম্বন করে ত্রিপুরার নাট্যচর্চা প্রায় তার অর্ধেক সময় অতিবাহিত করেছে।

(৭)

এবার আসি ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মধ্যে নাট্যচর্চার কথায়। রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে যে সব নাট্য সংস্থা ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এবং তারপর চল্লিশের দশক অবধি সময়ের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল তাদের অনেকেই হয়তো আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের উত্তরসূরী হিসেবে জন্ম নিয়েছিল যেসব নাট্যদল তাদের মধ্যে

অনেকেই ষাটের দশক অবধি প্রায় নিয়মিতই নাট্যচর্চা চালিয়ে গেছে। এই নাট্যদলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ত্রিপুরা শিল্পায়তন, লোকশিল্পী সংসদ, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ ইত্যাদি। নাট্যচর্চায় সেদিন যাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম — ত্রিপুরেশ মজুমদার, সুধাংশু দত্ত, বারীন চট্টোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশ পাল, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরালাল সেনগুপ্ত, তপেশ রায়, রঞ্জিত ভৌমিক, মৃণাল চক্রবর্তী, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, ডঃ হেমেন্দু শেখর রায়চৌধুরী, শক্তি হালদার, বিমল গুপ্ত প্রমুখ। এঁদের নাট্য চর্চায় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর তেমন একটা না থাকলেও কোলকাতার মঞ্চ সফল নাটকগুলি তাঁরা বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই প্রয়োগ করতেন। ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা ও নিষ্ঠা মঞ্চস্থ নাটকগুলিকে মোটামুটিভাবে উপভোগ্য করে তুললেও দলগত শৃঙ্খলা ও পর্যাপ্ত মহলার অভাব সহজেই চোখে পড়তো। তবুও বলবো দর্শকের উদাসীনতা ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভাব সত্ত্বেও নাট্যচর্চার ধারাকে তাঁরা সেদিন বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সেখানেই তাঁদের সার্থকতা।

ষাটের দশক অবধি আগরতলায় নাটক মঞ্চস্থ হতো মূলতঃ স্কুল, কলেজগুলির মিলনায়তনে। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের রবীন্দ্র হল, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হল, উমাকান্ত একাডেমীর মিলনায়তন, বড়দোয়ালী স্কুলের অডিটোরিয়াম ইত্যাদিই সেদিন ছিল নাট্য প্রয়োগের কেন্দ্র। পাব্লিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় বলতে সেদিন কিছুই ছিল না।

সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে ওঠে ১৯৭২ সালের সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন নামে। সত্তরের দশককেই প্রকৃতপক্ষে চিহ্নিত করা যায় ত্রিপুরায়, বিশেষ করে আগরতলায় নাট্যচর্চার জোয়ারের দশক নামে। ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকেই এই জোয়াবের শুরু। কয়েকজন তরুণ 'রূপম' নাম দিয়ে সংগঠিত করেন একটি নাট্যগোষ্ঠী। নাট্যচর্চার প্রতি নিষ্ঠায়, কঠিন শৃঙ্খলাবোধের গুণে এবং দলগত অভিনয়ের নৈপুণ্যে এই 'রূপম' গোষ্ঠী শুরু থেকেই দর্শকমনে এক শ্রদ্ধাব স্থান গ্রহণ করে নেয়। সুবোধ দে, মানস গাঙ্গুলী, শিশির দেব, শশাঙ্ক চক্রবর্তী, ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, পার্থ দেব, অসীম দত্তরায়, নিলিপ পোদ্দার, বিশু সেন এবং আরও অনেকে। যাঁরা সেদিন এই নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, তাঁরা সবাই যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন এমন নয়। কিন্তু মহলায় উপস্থিত থাকা থেকে শুরু করে মঞ্চায়ন শেষে মঞ্চ থেকে মঞ্চসজ্জা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজে এঁরা সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন, যা পূর্বের নাট্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দেখা যেত না। ত্রিপুরেশ বাবুকে ৬০-৬২ সালে যেখানে দেখতাম নাটক শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তেও টিকিট বিক্রির হিসাব করছেন, সুবোধ দে-কে সেখানে কোন দিনও দেখিনি টিকিট বিক্রীর মতো সাংগঠনিক দায়িত্ব দূরে থাকুক রূপসজ্জা বা মঞ্চসজ্জার খুঁটিনাটি নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঘামাচ্ছেন। যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রম বিভাজন এই নাট্য গোষ্ঠীর প্রয়োগ সফলতার মূলমন্ত্র ছিল। 'সেট' কেমন হবে, 'মেক আপ' কি ধরণের হবে Theme music বা effect music কী হবে, পোষাকের স্টাইলই কী হবে এসব নিয়ে নির্দেশক হিসেবে সবোধ দে নিশ্চয়ই তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই নিশ্চয় চবম বলে মেনে নেওয়া হতো, কিন্তু চিন্ময় রায়ের কাজ চিন্ময় রায় করতেন, বিশু সেনের কাজ বিশু সেন করতেন এবং অসীম দত্তরায়, নিলীপ

পোদ্দারের কাজ অসীম দত্তরায় ও নিলীপ পোদ্দারই করতেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের ওপর নিয়ে — তা সে কাজ মঞ্চসজ্জাই হোক কিম্বা রূপসজ্জাই হোক, সুভেনির ছাপানোই হোক কিম্বা টিকিট বিক্রিই হোক। অভিনয়েও তাঁরা এনেছিলেন নতুনত্বের ছাপ যা সেদিন অন্ততঃপক্ষে ত্রিপুরার দর্শকের কাছে নতুনই ছিল। 'Stylized' অভিনয়ের ধারায় সুবোধ দে, মানস গাঙ্গুলীর অভিনীত গদাই (এস্ত্রাগন), ভূতো (ভলাডিমির) 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' 'Waiting for godot' নাটককেই শুধু সেদিন আগরতলার দর্শকদের কাছে এক নতুন স্বাদের নাটক হিসেবে পরিচিত করে দেয়নি, 'Stylized' অভিনয়ের ধারাকেও আগরতলার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বা এক কথায় নাটক নির্বাচনে অবশ্য তাঁদের 'নবনাট্য আন্দোলন' কিংবা 'গণনাট্য আন্দোলনের' শরীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ একদিকে যদি তাঁরা Samuel Backett এর Waiting for Godot নাটকের বাংলা রূপান্তর মঞ্চস্থ করে Absurd Dramaর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন, অন্যদিকে তাহলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প অবলম্বনে রচিত 'বাগদী পাড়া দিয়ে' নাটক মঞ্চস্থ করে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের প্রতিও তাঁদের আনুগত্য দেখিয়েছেন। একথা সত্যি যে দৃষ্টিনন্দন composition শ্রুতিমধুর বাচিক অভিনয়, সুষম ছন্দে অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে 'বিভাব', 'অনুভাব', ও 'সঞ্চারীভাবেব' সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা 'রসনিষ্পত্তি' ও রসিকচিত্ত বিনোদনই তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল, গণচেতনা জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে নাট্যচর্চাকে কাজে লাগানো তাঁদের ব্রত ছিল না। তাঁদের অভিনীত 'শের আফগান', 'নানা রঙের দিন', 'টেরোড্যাকটিল', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'রাজরক্ত' - ইত্যাদি নাটক স্বভাবতঃই মনে করিয়ে দেয় নান্দীকার, বহুরূপী, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রমুখ কোলকাতার নবনাট্য আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত নাট্য দলগুলির কথা।

গণনাট্য আন্দোলনে ব্রতী ত্রিপুরার নাট্যদল বলতে সেদিন বোঝাতো 'আগরতলা লিট্‌ল ড্রামা গ্রুপ' ও 'সংস্কৃতি পরিষদ'কে। এঁরা মূলতঃ মঞ্চস্থ করতেন উৎপল দত্তের লেখা ও মঞ্চে প্রয়োগ করা নাটকগুলি। সংস্কৃতি পরিষদ অবশ্য কোলকাতার 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি বহুবার প্রয়োগ করে নাটকটিকেই শুধু আগরতলায় জনপ্রিয় করে তোলেন নি, যুগে যুগে শোষণের চরিত্র যে একই থেকে গেছে, শাসকের কৌশলেরও যে কোন পরিবর্তন হয়নি একথা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। বারটল্ড্ ব্রেষটের এলিয়েনেশনের থিয়েটার আগরতলাব মঞ্চে পরিচিত করান লিট্‌ল্ ড্রামা গ্রুপ তাঁদের 'নিয়ম ও ব্যতিক্রম' নাটকের মধ্য দিয়ে। একদিকে 'রূপম' নাট্যগোষ্ঠী ও অন্যদিকে এল, ডি, জি, কিম্বা সংস্কৃতি পরিষদের মধ্যে নাট্য প্রয়োগের বিষয়ে যে পার্থক্যটি সহজেই চোখে পড়তো তা ছিল 'রূপম' অভিনীত নাটকে চরিত্র স্বল্পতা অপরদিকে এল. ডি, জি, কিংবা সংস্কৃতি পরিষদের অভিনীত নাটকে গণনাট্য ধাবা অনুযায়ী চরিত্র সংখ্যার আধিক্য। বহু অভিনেতাকে একসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করে নাটকের দৃশ্যকে বাস্তব জীবনের একটি খণ্ডচিত্র করে তোলার যে নিপুণতা উৎপলবাবু দেখাতে পারতেন, তা হয়তো অশোক চক্রবর্তী, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা হীরালাল সেনগুপ্তের পক্ষে সম্ভব হয়নি — কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সাহসিকতার ও ক্ষেত্র বিশেষে মৌলিকতার প্রশংসা অর্জন করেছিল। এল, ডি, জি'র সদস্যদের মধ্যে অশোক চক্রবর্তী ছাড়াও অহীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রদীপ বসু, অমূল্য বণিক, প্রশান্ত দে যেমন সাবলীল অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন তেমনি সংস্কৃতি

পরিষদে কল্যাণ রায়, শিশির মজুমদার প্রমুখ ছিলেন দক্ষ অভিনেতা। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরালাল সেনগুপ্ত অপেরাধর্মী নাট্য প্রয়োগে যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন — বিশেষ করে 'চাঁদ সদাগর পালা'য় তা যদি এল, ডি, জি'র নাট্য প্রয়োগে অনুপস্থিত থেকে থাকে তার মূল কারণ এল, ডি, জি'র প্রয়োগ ছিল মূলতঃ বাস্তবানুগ বা naturalist. সত্তরের দশকে নাট্যচর্চার জোয়ার আনার অনেকটা কৃতিত্ব বর্তায় 'রঙ্গম' নাট্যগোষ্ঠীর ওপর। এই নাট্যগোষ্ঠীই সত্তরের দশকে পর পর দু'বার সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে নাট্যমেলার আয়োজন করে — ১৯৭২ সালে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ও ১৯৭৫ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। প্রথম নাট্য মেলাটিতে আগরতলার প্রতিষ্ঠিত দলগুলি আমন্ত্রিত হয় পুরনো সামাজিক নাটক সধবার একাদশী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নাটক (রাজা), আধুনিক অনূদিত নাটক (মলাটের রং মুহূর্ত) ও আধুনিক মৌলিক (টেরোড্যাকটিল) মঞ্চস্থ করার জন্য। আগরতলার দর্শক সেদিন রঙ্গমের সৌজন্যে বিগত একশো বছরের বাংলা নাটকের ধারার সঙ্গে পরিচয় চালিয়ে নেন এই নাট্যমেলার মধ্যে দিয়ে। রঙ্গম নাট্যগোষ্ঠীর নিজস্ব নাট্য প্রয়োগে মৌলিকতার চেষ্টা থাকলেও নৈপুণ্যে তাঁরা রূপমকে অতিক্রম করতে পারেন নি। প্রশান্ত গাঙ্গুলীর উদ্যমে, সুকুমার দাসের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় ও অজয় নন্দী, অমরেন্দ্র রক্ষিত, সলিল দেববর্মা, শ্যামল চন্দ, প্রমথেশ দেবরায়, অমিতাভ দেবরায়, গোপাল সাহা, নগেন্দ্র সাহা প্রমুখ সদস্যদের উৎসাহে রঙ্গম নাট্যগোষ্ঠী যে সেদিন শুধু নাট্য মেলারই আয়োজন করেছিল তাই নয়, বাদল সরকারকে কোলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে এনে একটি থিয়েটার ওয়ার্কশপেরও ব্যবস্থা করে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় জলধর মল্লিকের একক নাটক, মানিক চক্রবর্তীর থিয়েট্রন ইত্যাদি। এই সত্তরের দশকেই শুরু হয় আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতা। আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতা এই সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে সব থেকে বেশী। আশির দশকে ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় প্রথম সারির স্থান করে নেয় মহকুমা শহর খোয়াই ও কৈলাশহর। আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে যে সব প্রতিভা স্ফুরিত হওয়ার সুযোগ পায় তার মধ্যে সঞ্জয় করের নামই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। খোয়াই শহরের কালচার্যাল ক্যাম্পেন নাট্যগোষ্ঠী নাট্যচর্চায় শৃঙ্খলা ও অনুশীলনের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তই শুধু তোলে ধরেনি, তাদের এক সহকর্মীর অকাল মৃত্যুকে — যা ঘটেছিল নাট্যকর্মে অংশগ্রহণের সময় বৈদ্যুতিক গোলযোগ জনিত এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় — স্মরণীয় করে রাখতে তারা শুরু করেছিল এক বার্ষিক নাট্য প্রতিযোগিতা— শেখর স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা নামে, যা আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাট্যচর্চার জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। খোয়াইয়ের কমল রায় চৌধুরী রচিত 'দেব না তিতুন' নাটক শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় কোলকাতার মঞ্চেও সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করে খোয়াইয়ের কালচার্যাল ক্যাম্পেন নাট্যগোষ্ঠী ত্রিপুরার নাট্যচর্চাকে একটি মৌলিকতার দাবীদার করে তোলে, কারণ এই নাটকের পটভূমি যেমন ত্রিপুরার নিজস্ব মাটি, এর বিষয়বস্তু, ভাষা, সামাজিক ছবি সব কিছুই পার্বত্য ত্রিপুরার নিজস্ব। কমল রায় চৌধুরী ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় আর কোন তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান না যোগালেও ঐ খোয়াই-এরই আরেক নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত দিনে দিনে তাঁর নাট্য রচনাকে উন্নততর করে তুলেছেন। তাঁর রচনা 'সাদা পায়রার জন্য' কোলকাতার মঞ্চেও

বেশ সমাদর লাভ করে। যুদ্ধ বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা ইত্যাদি সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল নাটক যেমন তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে, সেই রকমই হাল্কা প্রহসন রচনাতেও তিনি তাঁর মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন বেশ কয়েকবার। খোয়াইয়ের নাট্যচর্চা আজ আর শুধু কালচারাল ক্যাম্পেন নির্ভর নয়। বেশ কয়েকটি নাট্য সংস্থা আজ সেখানকার নাট্য প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। খোয়াইয়ের নাট্যচর্চার এই অগ্রগতির পিছনে হীরেন্দ্রনাথ সিংহ, নীরেন ঘোষ, অভীক চক্রবর্তী, নন্দা দাসগুপ্ত, বিভাষ বাবুদের অক্লান্ত নিষ্ঠা যেমন কাজ করেছে তেমনি খোয়াই শহরের নাট্যামোদীদের অকুন্ঠ উৎসাহ দানও এই চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি।

কৈলাশহরের ক্ষেত্রে কিন্তু একথা তেমনভাবে খাটে না। রতীশ মজুমদার, রবীন্দ্র ভট্টাচার্যরা প্রায় পুরোপুরিই নিজেদের উৎসাহে কৈলাশহরের নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এ ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য করলেও রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর নাট্য গোষ্ঠী ঐ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তেমন একটা যুক্ত নন। যাই হোক, ত্রিপুরার মহকুমাগুলিতে নাট্যচর্চা আজ রাজধানী আগরতলাকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পরোক্ষে একটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার। যাঁরা প্রতিটি মহকুমা শহরে টাউন হল নির্মাণ করে সাধাবণ বঙ্গালয়ের ব্যবস্থা কবে দিযেছিলেন, যেখানে নাট্যচর্চা তার পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি মঞ্চ পেয়েছিল।

ত্রিপুরায় নাট্যচর্চায় আজ স্থানীয় নাট্যকারদেরও সোৎসাহ যোগদান রয়েছে। চন্দন সেনগুপ্ত .যেমন নাটক রচনা কবে চলেছেন খোয়াইয়ের নাট্য গোষ্ঠীগুলিকে তাদের performing art এর text যোগাতে, অজিত মজুমদার, নিখিল ভট্টাচার্য প্রমুখও তেমনি নাটক রচনা করে চলেছেন আগরতলাস্থিত তাঁদের নিজেদেব নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে নাটক যোগাতে।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যদিও আক্ষেপ করেছি ত্রিপুরার উপজাতি ভাইরা কেন তাঁদের নিজের ভাষায় নিজস্ব প্রয়োগ রীতিতে নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন না, কিন্তু আলোচনাটি শেষ করাব আগে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করছি যে সেই আক্ষেপ ১৯৯৪ সালে আগরতলার কৃষ্ণনগরের 'লাম্প্রা' নাট্যগোষ্ঠী মিটিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য ভিত্তিক একটি নাট্য প্রতিযোগিতায় তাদের পরিবেশিত 'চেথুয়াং' নাটকটি শুধু যে ককবরক ভাষায় রচিত ও ত্রিপুরী লোককাহিনী আশ্রিত একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা ছিল তাই নয়, শ্রেষ্ঠ রাজ্যদল হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ভূপালে সারা ভারত নাট্য প্রতিযোগিতায় ঐ প্রযোজনাটি শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনার পুরস্কারেও সম্মানিত হয়। লাম্প্রার অপর একটি ককবরক নাট্য প্রযোজনা 'নীলবর্ণ শৃগাল' অন্যমুখ সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত পথনাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে দুটি প্রযোজনাতেই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে যে নিপুণভাবে ব্যবহার করে অভিনয় ধারায় তাঁরা যে বৈশিষ্ট্য অর্জন কবেছেন, সেটা অতি ব্যবহারের ফলে একঘেয়েমি এনে দিতে পারে ভবিষ্যতে। মণিপুরের বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক কান্হাইয়ালালের অভিনয় ধারাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে নিজেদের মৌলিকত্ব তাঁরা হারিয়ে ফেলতে পারেন।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার আর একটি দিকের কথা না বললে এ আলোচনা অনেকখানিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই দিকটি হলো নাট্যচর্চায় মহিলাদের সোৎসাহ অংশগ্রহণ।

কোলকাতার অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীরাও যেখানে দু-একজন তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, শাঁওলি মিত্র ছাড়া মহিলা শিল্পী পাননা, ত্রিপুরাতে সেখানে উৎসাহী মহিলা নাট্যকর্মীর অভাব নেই। ষাটের দশকে হয়তো দু'একজন রাণী সেন, মঞ্জু মিত্র এগিয়ে আসতেন, কিন্তু সত্তর-আশির দশকে আমরা দেখেছি ইরা গাঙ্গুলী, সবিতা মজুমদার, পাপিয়া বসু, রেখা ভট্টাচার্য, শিখা চক্রবর্তী, নমিতা সিংহরায়, চিত্রা মৈত্র, ভারতী মৈত্র, শেলি মুখার্জি, শিপ্রা ভৌমিক, রঞ্জিতা মজুমদার, রীতা সিংহ রায়, সবিতা দেববর্মা, বেলা মজুমদার, শ্রীমতি হাজরা প্রমুখ মহিলা নাট্যকর্মীকে সোৎসাহে এগিয়ে আসতে। আর নব্বইয়ের দশকে- এই গত বছর আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতায় দেখা গেল অভিনয়ের মানে অভিনেত্রীরা অভিনেতাদের সার্বিকভাবে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছেন। শ্রীমতি তপশ্রী গাঙ্গুলীর নাম এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় আলোক শিল্পীর অভাবের কথা। হরিপদ দাস মহাশয়কে বাদ দিলে তেমন উন্নতমানের আলোক শিল্পী ত্রিপুরায় আর নেই। হরিপদবাবু সেই ষাটের দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি বলা যায় এক এবং অদ্বিতীয় আলোক শিল্পী যিনি নিজের খরচে নিজের সখে নানা ধরণের আলোক-সম্পাতের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে রেখেছেন কবে, কোন্ নাট্যগোষ্ঠীর কী কাজে লাগবে এই আশায়। পথ নাটক আজ ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় আপন স্থান করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে কৃতিত্বের দাবীদার মুখ্যতঃ পার্থ রায় ও তাঁর নাট্যগোষ্ঠী- ইয়ুথ কয়ার এবং মানিক চক্রবর্তী ও তার নাট্যদল থিয়েট্রনের। আলোচনাটির দৈর্ঘ্যে মনে হতে পারে আলোচক নিজের রাজ্যের নাট্যচর্চাকে অনেক বড় করে দেখাতে গিয়ে প্রগলভতা ও বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিয়ে প্রবন্ধটির কলেবর স্ফীত করতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখকের বিনীত নিবেদন এই যে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে এ রাজ্যের নাট্যচর্চা চাক্ষুষ করে তার যা মনে হয়েছে সে তাই লিখেছে। ছোটকে বড় বা বড়কে ছোট করার কোন দুরভিসন্ধি তার নেই। যদি উল্লেখযোগ্য কারও নাম বা অবদান বাদ গিয়ে থাকে তাহলে তা অনবধানতাবশতঃ এবং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাজনিত, জ্ঞানতঃ বা ইচ্ছাকৃত নয়।

লেখক পরিচিতি

কৈলাস চন্দ্র সিংহ

জন্ম ১৮৫১ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ''হিন্দু হিতৈষী'' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর নিয়মিতভাবে বান্ধব, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, নবভারত, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি বিখ্যাত সাময়িক পত্রে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ''রাজমালা ও ত্রিপুরার ইতিহাস'' প্রকাশিত হয় এবং প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে। তার অন্যান্য গ্রন্থ সাধন সঙ্গীত, দারুব্রহ্ম, কাঙ্গালগীতা ও জোয়ানের জীবন চরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণপদ দত্ত

দীর্ঘদিন ত্রিপুরায় সরকারি উচ্চপদে কাজ করে গেছেন। ইতিহাস ও শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক বহু মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। ত্রিপুবাব ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি একটি গ্রন্থও লিখেছেন। শিক্ষা ও তথ্যসংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা পদে থাকাকালে তিনি 'গোমতী' ও 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মহেন্দ্র দেববর্মা

তাঁর সমগ্র জীবন ত্রিপুরার আদিবাসী লোকসাহিত্য চর্চায় নিবেদিত। আদিবাসী লোক শিল্পের তিনি খ্যাতিমান শিল্পীও। চল্লিশের দশক থেকে ককবরক ভাষায় গণসঙ্গীত রচনা, সুর সংযোজনা এবং স্বকণ্ঠে পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার পাহাড়-কন্দরে একজন জনপ্রিয় শিল্পী। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত আজও গ্রাম-পাহাড়ে সমান আদৃত। ত্রিপুরার আদিবাসী সংস্কৃতির ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে কোনদিন লেখা হবে না। বিগত ১৮ই অক্টোবর ১৯৯৫ইং তিনি প্রযাত হয়েছেন। প্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'ইয়াপ্রি' নামে একটি ককবরক-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখালেখি ছড়িয়ে আছে।

স্বপন সেনগুপ্ত

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া', 'এ আমার ভিখারী হাত নয়' তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কবি-খ্যাতির পাশাপাশি একজন উল্লেখনীয় গদ্য লেখক হিসেবেও তিনি সুপবিচিত। বক্তব্যে ও রচনায় স্বতন্ত্রধর্মী তার প্রচুর প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। 'দ্বাদশ অশ্বারোহী' (পৌণমী প্রকাশণ) নামে ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট কাব্য সংগ্রহের তিনি সম্পাদনা করেছেন। 'নান্দীমুখ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও তিনি সিকি শতাব্দীর উপর সম্পাদনা করে আসছেন।

অপরাজিতা রায়

ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে দীর্ঘদিন ধরে আসীন থাকা

সত্ত্বেও অপরাজিতা রায়ের পরিচিতি তিনি এ রাজ্যের শিল্প সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট আলোচক। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সাহিত্যের বিবর্তিত বাস্তব', 'এখনো অন্ধকার' (গল্প গ্রন্থ) তাঁকে ত্রিপুরার সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিনী করেছে। তিনি বেশ কিছু ছড়া এবং কবিতাও রচনা করেছেন। তার ছড়ার সংকলনের নাম — 'বাইরে বাউল' ও 'ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা'।

সিরাজুদ্দীন আমেদ

একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অনুক্ষণ সংগ্রাম', 'বন্দী জেগে ওঠো', 'স্বপ্নের ক্ষেতে দ্বিখণ্ডিত চাঁদ', তাকে কবি হিসেবে ত্রিপুরায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করেছে। তার গবেষণা গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা চিন্তা', 'রবীন্দ্র-নজরুল সুকান্ত মানিক ঃ মার্কসীয় বীক্ষ্যা', 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', 'মীর মশাররফ হুসেন' ভাষা গবেষণায় মূল্যবান সংযোজন।

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ

চিত্রশিল্পী প্রাবন্ধিক সলিলকৃষ্ণ থেকে কবি সলিলকৃষ্ণের পরিচয় এ রাজ্যে সমধিক। এ রাজ্যের আধুনিক কবিতায় তিনি একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। সাতের দশকে পৌণমী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জলের ভেতর বুকের ভেতর' এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত 'মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা' (পৌণমী প্রকাশন) কাব্য গ্রন্থের জন্য এ রাজ্যে তিনি সমধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি যে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ছাত্র এ পরিচয় তাঁর পরিচিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যদের কাছে অজ্ঞাত প্রায়। তিনি যে চিত্রশিল্পের একজন বিশিষ্ট ছাত্র এবং উজীর বাড়ির বংশধর হিসেবে রাজ আমলের চিত্রশিল্পের যথেষ্ট সমঝদার এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এ প্রবন্ধ পাঠে পাঠকরা তার পরিচয় পাবেন।

রত্না দাস

আগরতলা সংগ্রহশালার প্রাক্তন কিউরেটর ও সরকারী মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা। শ্রীমতী রত্না দাস ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট লেখিকা। ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছেন যা পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

বামাপদ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজি সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে যেমন তিনি সুখ্যাত, তেমনি ত্রিপুরার নাট্যচর্চার সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত। নাট্য পরিচালনা, অভিনয়, সব ক্ষেত্রেই রেখেছেন যোগ্যতার স্বাক্ষর। ত্রিপুরার নাট্যচর্চা বিষয়ে সম্যক অবহিত এ রাজ্যে যে কয়জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন শ্রী মুখোপাধ্যায় তাদের অন্যতম। ত্রিপুরার নাট্যচর্চা বিষয়ে তার প্রচুর লেখালেখি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।